ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব

ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

আহসান পাবলিকেশন
ঢাকা

ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

প্রকাশনা
আহ্সান পাবলিকেশন
❑ ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন : ৭১২৫৬৬০
❑ কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা, ফোন-৯৬৭০৬৮৬
❑ ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা।

পরিমার্জিত ও বর্ধিত সংস্করণ
মার্চ ২০০৪ ঈসায়ী
ফালগুন ১৪১০ বাংলা
মুহাররম ১৪২৫ হিজরী

কম্পোজ
আহ্সান কম্পিউটার
কাটাবন, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র। (অফসেট)

ISLAMER ARTHONAITIK BIPLOB (The Revolution of Islamic Economy) by **Shah Muhammad Habibur Rahman**, Professor of Economics, Rajshahi University, Publised by Ahsan Publications, Katabon Masjid Campus. Dhaka-1000, Revised and Enlarged Edition March 2004 Net Price Tk. 35.00 only. (U.S.$ 1.00)

AP-04/21

প্রকাশকের কথা

ইসলামের অর্থনীতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ জ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু মানুষের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় পুস্তক খুবই কম। বলতে গেলে কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ ছাড়া বাংলায় রচিত ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা একেবারে হাতে গোনা।

ইদানিং অনেকেই এ বিষয়ে লেখালেখি করছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক জনাব শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান এ বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন যা পরে 'ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবী রূপ তিনি পূর্বেই তুলে ধরেছেন ছোট একটি গ্রন্থে- যা ইসলামী সংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী থেকে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থটিই পরিমার্জিত ও বর্ধিত সংস্করণ আমরা প্রকাশ করলাম 'ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব' নামে। এ গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে- যা বর্তমান অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা এবং সীমাহীন হতাশা থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে সক্ষম।

পাঠকবৃন্দ বইটি পড়লে ইসলামী অর্থনীতির একটি মৌলিক ধারণা লাভ ছাড়াও রাসূলে কারীম (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদার (রা) যুগেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইসলাম কী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত করেছিল সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! মহান রাব্বুল আলামীনের অপার কৃপায় আবারও আলোর মুখ দেখছে **ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব**। প্রায় তিন দশক বেশী আগে প্রথম প্রকাশিত হয়েই পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল বইটি। বিশ্বজুড়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে জানার ও বুঝাবার জন্যে এখন বিপুল কর্মোদ্যোগ চলছে; ইসলামী জীবনদর্শন বাস্তবায়নের জন্যে চলছে নিরলস প্রয়াস। এদেশের তরুণ-তরুণীরাও সেই আন্দোলনে শামিল। মূলতঃ তাদের প্রাথমিক জ্ঞান লাভের জন্যেই রাসূলে কারীম (সা) ও মহান খুলাফায়ে রাশিদীন (রা) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে যুগান্তকারী তথা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সেসব কর্মসূচীর কথাই সংক্ষেপে বইটিতে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বইটি প্রকাশের জন্যে **আহ্‌সান পাবলিকেশন** এগিয়ে আসার জন্যে তাদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। বিশেষ করে জনাব গোলাম কিবরিয়ার স্বতঃপ্রবৃত্ত উদ্যোগ ধন্যবাদের দাবী রাখে। নেপথ্যে থেকে যারা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও এই সুযোগে ধন্যবাদ জানাই। সবশেষে যাদের উদ্দেশ্যে এই বই লেখা বাংলাদেশের সেই অযুত তরুণ-তরুণীদের ইসলামী অর্থনীতি বুঝতে কিছুমাত্র উপকার হলে আমার শ্রম সার্থক বলে বিবেচনা করবো। আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর সীরাতুল মুস্‌তাকিমে চলার তৌফিক দিন এবং আমাদের জীবনে তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক এই হোক– আমাদের সকলের দোয়া। আমীন।

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

উৎসর্গ

তাদের হাতে-
ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন
আমৃত্যু বাসনা যাদের।

বিষয় সূচি

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রারম্ভিক কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে শান্তি, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। নবী ও রাসূলগণের কাজই ছিল মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সামগ্রিক জীবনধারাকে আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত করার নির্দেশ দেয়া। কারণ সে পথেই শুধুমাত্র শান্তি ও উন্নতির সমন্বয় সাধন সম্ভব। মানুষের মনগড়া কোন বিধান বা আদর্শই মানুষকে স্থায়ী এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তি দিতে পারে না। বরং সেসব মনগড়া আদর্শ মানুষের মধ্যে আরও বেশী অবিশ্বাস, হানাহানি, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি করেছে, সামাজিক নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক নবীই মানুষের সামগ্রিক জীবনকে সুখ ও শান্তিময় করার লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। আর বিশ্বমানবতার জন্যে প্রেরিত আল্লাহর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চূড়ান্তভাবে তার পূর্ণতা দান করেছেন। তাঁরই প্রদর্শিত পথে চলে আইয়ামে জাহেলিয়াতের আরববাসী বিশ্বসভ্যতায় নিজেদেরকে শুধু প্রতিষ্ঠিতই করেনি, ভবিষ্যতে উন্নতি ও প্রগতির দিক নির্দেশ করেছে।

রাসূলে কারীম হযরত মুহাম্মদ (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁর দশ বছরের সংগ্রামী ও বিপ্লবী জীবনে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই যেমন অর্থনৈতিক নীতি-নির্দেশনা থাকে, এ রাষ্ট্রেও তিনি তার প্রবর্তন করেন। তাঁর অনুসৃত ও প্রদর্শিত অর্থনৈতিক বিধানসমূহের উৎস ছিল আল-কুরআন। আর সে পথ অনুসরণ করেই এককালের তমসাচ্ছন্ন ও দরিদ্র আরববাসী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে রূপান্তরিত হতে পেরেছিল। কারণ, তিনি প্রচলিত অর্থনৈতিক নীতি ও ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক মহাবিপ্লব এনেছিলেন। সে বিপ্লবের পথ ধরেই রূপায়িত হয়েছিল যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। ফলশ্রুতিতে বিশাল ইসলামী বিশ্বে একটা সুশৃঙ্খল ও

সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। সেই উন্নতি ও সমৃদ্ধির ছত্রছায়ায় মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতি চর্চা এগিয়ে চলেছিল।

বিপ্লবের অর্থ যদি এই হয় যে, তা প্রচলিত ব্যবস্থা বা ধ্যান-ধারণাকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে উৎখাত করে এবং পরিণামে তা জনগণের বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ আনয়ন করে তবে রাসূলে কারীম (সা) যে বিপ্লব সংঘটিত করেছিলেন তা ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের যে বিপ্লব রাসূলে করীম (সা) এনেছিলেন তার দুটি দিক রয়েছে। একদিকে কতকগুলি নতুন বিষয়ের প্রবর্তন, অন্যদিকে পূর্বের কতকগুলি প্রচলিত শোষণ ও পীড়নমূলক ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ ।

প্রচলিত অর্থনীতির কদর্য ও শোষণধর্মী পন্থাসমূহ বিলুপ্তির সাথে সাথে উত্তম ও হিতকর ব্যবস্থার প্রবর্তন ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যে পরিবর্তন সূচনা করেছিল তা আদর্শ, ধ্যান-ধারণা এবং বাস্তব ফলাফলের দিক দিয়ে ছিল বিপ্লবাত্মক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের কাছে সেসব আজ অজ্ঞাত। খালি চোখে দেখা যায় না বলে জীবাণুর অস্তিত্ব যেমন অস্বীকার করা যায় না, আমরা জানি না বলেই ইসলামের অর্থনীতি নেই বা ছিল না এ রকম অন্যায় ও অসঙ্গত দাবীও করা যায় না। বরং উচিত হবে ইসলামের সেই গৌরবোজ্জ্বল যুগের কর্মকাণ্ড হতে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আমাদের অবস্থার পরিবর্তনে সচেষ্ট হওয়া। আজ সময় এসেছে মূঢ়তা, অজ্ঞতা ও একদেশদর্শিতার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে আল্লাহর নির্দেশিত ও তাঁর রাসূলের (সা) প্রদর্শিত পথে চলার। একমাত্র এ পথেই নিহিত রয়েছে বিশ্বমানবতার মুক্তি। এছাড়া মুক্তির অন্য কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নেই।

প্রচলিত অর্থনীতিতে ইসলামের দৃষ্টিকোণ হতে রাসূলে কারীম (সা) ও খুলাফায়ে রাশিদীন (রা) যে নতুন বিষয়গুলির প্রবর্তন করেছিলেন, প্রকৃতিতে যা ছিল প্রকৃতই বিপ্লবী, সেগুলি হচ্ছে :

১. যাকাত ব্যস্থার প্রবর্তন;

২. বায়তুলমালের প্রতিষ্ঠা;

৩. উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন ও স্বাভাবিকীকরণ;

৪.মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন;

৫. ভূমি-রাজস্ব ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন;

৬. সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা;

৭. বৈধ পন্থায় উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের নির্দেশ;

৮. করযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তন;

৯. ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান এবং

১০. সমাজকল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন।

অর্থনীতির পরিমণ্ডলে যেসব বিষয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা ও সমূলে উৎপাটন করা হয়েছে সেগুলি ছিল :

১. সুদ ও সুদভিত্তিক সমস্ত কর্মকাণ্ড।

২. অবৈধ উপায়ে আয় ও অবৈধ পথে ব্যয়।

৩. ব্যবসায়ে সর্বপ্রকার অসাধুতা; এবং

৪. ফটকাবাজারী ও সর্ববিধ জুয়া।

উপরে উল্লেখিত মোট চৌদ্দ দফা সম্পর্কে আলোচনা করলে বোঝা যাবে, এসব পরিবর্তন ও সংস্কার তৎকালীন অর্থনীতিতে কি দারুণ বিপ্লবাত্মক ছিল, কি প্রবলভাবে তা সমগ্র জাতি ও দেশকে নাড়া দিয়েছিল, বৈশিষ্ট্যের দিক হতে কি সুদূরপ্রসারী ও প্রগতিশীল চরিত্রের ছিল এবং দেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নে কি বিপুল সহায়ক হয়েছিল। এই আলোচনা হতে বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য অর্থনৈতিক মতবাদের সঙ্গে ইসলামের অর্থনীতির মৌলিক পার্থক্যও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। ইসলামই যে বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তিসনদ একথা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করবে ইসলামী অর্থনীতির এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কর্মকাণ্ডগুলি।

১. যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন

যাকাত ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। আল-কুরআনে বারংবার নামায কায়েমের পরই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেন যাকাতের এই গুরুত্ব ? ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টনের তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবেই যাকাতকে গণ্য করা হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্যে যাকাত একটি অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। যাকাতের সঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য সব ধরনের করের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কারণ, ইসলামের এই মৌলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাধারে নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধ অন্তর্নিহিত রয়েছে। কিন্তু সাধারণ করের ক্ষেত্রে কোন নৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক তাগিদ নেই।

যাকাত ও প্রচলিত করের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রথমত : কর হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ যার জন্যে করদাতা কোন প্রত্যক্ষ উপকার প্রত্যাশা করতে পারে না। সরকারও করের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দরিদ্র ও অভাবী জনসাধারণের মধ্যে ব্যয়ের জন্যে বাধ্য থাকেন না। পক্ষান্তরে যাকাত হিসেবে আদায়কৃত অর্থ অবশ্যই আল-কুরআনে নির্দেশিত লোকদের মধ্যেই মাত্র বণ্টন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত : যাকাতের অর্থ রাষ্ট্রীয় সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু করের অর্থ যে কোন কাজেই ব্যয়ের ক্ষমতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা সরকারের রয়েছে।

তৃতীয়ত : যাকাত শুধুমাত্র বিত্তশালী (সাহেবে নিসাব) মুসলিমদের জন্যেই বাধ্যতামূলক। কিন্তু কর, বিশেষত পরোক্ষ কর, সর্বসাধারণের উপর আরোপিত হয়ে থাকে। অধিকন্তু প্রত্যক্ষ করেরও বিরাট অংশ জনসাধারণের উপর কৌশলে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

চতুর্থত : যাকাতের হার পূর্ব নির্ধারিত এবং স্থির। করের হার কিন্তু স্থির নয়। যে কোন সময়ে সরকারের ইচ্ছানুযায়ী করের হার ও করযোগ্য বস্তু বা সামগ্রীর পরিবর্তন হয়ে থাকে। সুতরাং, কোনক্রমেই যাকাতকে প্রচলিত

অর্থে সাধারণ কর হিসেবে যেমন গণ্য করা যায় না, তেমনি তার সঙ্গে তুলনীয়ও হতে পারে না।

ইসলামী ফিকাহ ও শরীয়ত অনুসারে যে সমস্ত সামগ্রীর উপর যাকাত ধার্য করা হয়েছে তা' হচ্ছে :

ক. সঞ্চিত বা জমাকৃত অর্থ;

খ. সোনা, রূপা এবং সোনা-রূপা দ্বারা তৈরী অলংকার;

গ. ব্যবসায়ের পণ্য সামগ্রী;

ঘ. কৃষি উৎপন্ন (ফসল);

ঙ. খনিজ উৎপাদন এবং

চ. সবধরনের গবাদি পশু।

উপরোক্ত দ্রব্য সামগ্রীর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যখন কোন মুসলমান অর্জন করে তখন তাকে যাকাত দিতে হয়। এই পরিমাণকে 'নিসাব' বলে। নিসাবের সীমা বা পরিমাণ দ্রব্য হতে দ্রব্যে ভিন্নতর। একইভাবে যাকাতের হারও দ্রব্য হতে দ্রব্য ভিন্নতর। যাকাতের হার সর্বনিম্ন শতকরা ২.৫% হতে শুরু করে সর্ব্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত হয়ে থাকে।[১]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকাত কাদের প্রাপ্য অর্থাৎ কাদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বন্টন করে দিতে হবে সে সম্পর্কে আল-কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ– فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ– وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ–

অর্থ : যাকাত তো পাওনা হলো দরিদ্র ও অভাবীগণের, যে সকল কর্মচারীর উপর আদায়ের ভার আছে তাদের, যাদের মন (সত্যের প্রতি) সম্প্রতি অনুরাগী হয়েছে, গোলামদের মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে (মুজাহিদদের জন্যে) এবং মুসাফিরদের জন্যে। এটি আল্লাহর তরফ হতে ফরয এবং আল্লাহ সব জানেন এবং সব বুঝেন।" (সূরা আত-তাওবা : ৬০ আয়াত)

---

১. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে বুখারী শরীফ দ্রষ্টব্য, যাকাত অধ্যায়।

উপরের আয়াত হতে সুস্পষ্টভাবে আটটি উদ্দেশ্যে যাকাতের অর্থ ব্যবহারের জন্যে নির্দেশ পাওয়া যায়। সেগুলি হচ্ছে :

ক. দরিদ্র জনসাধারণ;

খ. অভাবী ব্যক্তি;

গ. যে সকল কর্মচারী যাকাত আদায়ে নিযুক্ত রয়েছে;

ঘ. নও মুসলিম;

ঙ. ক্রীতদাস বা গোলাম মুক্তি;

চ. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি;

ছ. আল্লাহর পথে মুজাহিদ;

জ. মুসাফির।

এই আটটি খাতের মধ্যে ছয়টিই দারিদ্র্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্য দু'টিও (গ ও ছ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যাকাত আদায় ও ব্যবস্থাপনা একটি কঠিন ও শ্রমসাপেক্ষ কাজ। এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের এটাই সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। সুতরাং, তাদের বেতন এই উৎস হতেই দেয়া বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ যেসব ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামে লিপ্ত, তারাও অন্য কোনভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ হতে বঞ্চিত। যাহোক, এটা খুবই স্পষ্ট যে, উপরে বর্ণিত আটটি খাতেই যদি এই অর্থ ব্যয় হয় তাহলে দরিদ্রতা ও অন্যান্য বহু অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার নিরসন হবে। এভাবেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র সামাজিক অনিষ্টকর সমস্যাসমূহ হতে রেহাই পেতে পারে।

রাসূলে কারীম (সা) নিশ্চিতভাবেই জানতেন, ইসলামী রাষ্ট্রে মৌলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাকাতের প্রতিষ্ঠা হলে বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এসব উদ্দেশ্য নৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাকাতের অর্থ যথোপযুক্তভাবে বণ্টনের মাধ্যমে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ কতকগুলি অর্থনৈতিক উপকার বা কল্যাণ অর্জন সম্ভব।

প্রথমত : যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদশালী মুসলিমদের মন হতে ধন-সম্পদের লালসা দূরীভূত হবে। দরিদ্রদের অভাব মোচনের জন্যে

নিজেদের দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে তারা সচেতন হবে। বিত্তবান মুসলমানদের আল্লাহ সৎপথে তাঁদের সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। উদ্বৃত্ত অর্থ হতে প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে (পূর্বেই যার উল্লেখ করা হয়েছে) একটা অংশ দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের মধ্যে তাঁরা বিতরণ করবেন। এর ফলে তাঁরা যে শুধু আল্লাহর নিকটবর্তী হবেন তাই নয় বরং আখেরাতেও শান্তিময় জীবন লাভ করবেন।

ধর্মীয় অনুশাসনের প্রেক্ষাপটে যাকাত একটি অবশ্য পালনীয় কাজ বা ফরজ। যদি কোন বিত্তবান মুসলমান এই ফরজ আদায় না করেন তবে তার জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর এই নির্দেশ মান্য করবেন, তিনি ঈমানদার মুসলিম হিসেবে আল্লাহর তরফ হতে পুরস্কৃত হবেন। আর একজন প্রকৃত মুমিনের সম্মুখে একটাই মাত্র লক্ষ্য থাকে– আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টি অর্জন করা।

যাকাতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বহুবিধ। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান এবং মূখ্য হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে না দেয়া। ইসলাম সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যকে শুধু নিন্দাই করে না, বরং তা দূরীভূত করার কথাও বলে। তাই একটি সুখী, সুন্দর এবং উন্নত সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বিত্তশালী মুসলিমদের অবশ্যই তাঁদের সম্পদের একটা অংশ ব্যয় করা উচিৎ। এর ফলে যে শুধু অসহায় ও দুঃস্থ মানবতারই কল্যাণ হবে তাই নয়, সমাজে আয়-বণ্টনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য হ্রাস পাবে।

দ্বিতীয়ত : যাকাত মজুতদারী বন্ধ করারও এক প্রধান ও বলিষ্ঠ উপায়। মজুতকৃত সম্পদের উপরই যাকাত হিসেব করা হয়ে থাকে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ এবং মজুত সম্পদ যে কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই ধরনের অর্থের জন্যেই সরকার ফটকাবাজারী বন্ধ, মূল্য বৃদ্ধি রোধ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে থাকেন। পৃথিবীর যে কোন দেশের জন্যেই একথা সত্য তা সে দেশের রাজনৈতিক মতাদর্শ-গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সেক্যুলারিজম

ইত্যাদি যাই হোক না কেন। অবৈধভাবে অর্থ মজুত করার ফলে নানারকম সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলাই তার প্রকৃষ্ট নজীর।

সম্ভবত কোন পদ্ধতিই সার্থকভাবে উপরোক্ত সমস্যার মুকাবিলা করতে সক্ষম নয়। একমাত্র ইসলামেই তার সমাধান রয়েছে। কারণ বিত্তবানদের জন্যে তাদের মজুতকৃত অর্থ বা সম্পদের একটা অংশ নিছক বিলিয়ে দেবার মতো কোন পার্থিব কারণ নেই। কিন্তু ইসলামে একজন মুসলমানের আল্লাহ্ ও আখিরাতের ভয় রয়েছে। উপরন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে প্রবর্তিত আইনে সরকারের হাতে প্রভূত ক্ষমতাও রয়েছে মজুত সম্পদকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ব্যয়, বিতরণ বা সরকারের কাছে সমর্পণে বাধ্য করতে। এর ফলে বিত্তবানদের সামনে দু'টি মাত্র পথ খোলা থাকবে–

ক. শিল্প বা ব্যবসায়ে মজুতকৃত অর্থ বিনিয়োগ করা, এবং

খ. ইসলামী অনুশাসন অনুযায়ী তা ব্যয় করা।

তৃতীয়ত : যাকাতের মাধ্যমেই ইসলামী সমাজ হতে দরিদ্রতা দূর করা সম্ভব। এতে শুধু সমাজই নয়, রাষ্ট্রও উপকৃত হয় সমানভাবে। দারিদ্র্য মানবতার পয়লা নম্বরের দুশমন।

ক্ষেত্র বিশেষে তা কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যে কোন সমাজ ও দেশের এটা সবচেয়ে জটিল ও তীব্র সমস্যা। সমাজে হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্ট হয় দরিদ্রতার ফলে। পরিণামে দেখা দেয় সামাজিক সংঘাত। এর ফলে বহু সময়ে রাজনৈতিক অভ্যুত্থান পর্যন্ত ঘটে যায়। অধিকাংশ অপরাধই সচরাচর ঘটে থাকে দরিদ্রতার জন্যে। এ সমস্যাগুলির প্রতিবিধান করার জন্যে যাকাতই হচ্ছে ইসলামের অন্যতম মুখ্য হাতিয়ার। যে আট শ্রেণীর লোকের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যাকাত লাভের ফলে তাদের দিনগুলি আনন্দ ও নিরাপত্তার হতে পারে। যাকাত যথাযথভাবে আদায় ও ব্যবহার করা হলে সঙ্গতভাবেই আজও একথা বলা যায় যে, আজকের দিনেও এর মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের লোকদের মধ্যে যখন যাকাতের অর্থ বা সামগ্রী বন্টন করে দেয়া হয় তখন শুধু যে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয় তা নয়, বরং অর্থনৈতিক কার্যক্রমেও গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। দরিদ্র ও দুর্গত লোকদের ক্রয় ক্ষমতা থাকে না। বেকারত্ব তাদের নিত্যসঙ্গী। যাকাত প্রাপ্তির ফলে তাদের হাতে অর্থাগম হলে বাজারে কার্যকর চাহিদার সৃষ্টি হয়। এরই ফলে দীর্ঘ মেয়াদী সময়ে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তখন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নির্মাণের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হতে পারে অনুকূল পরিবেশ। ফলশ্রুতি হিসেবে প্রচলিত সামাজিক শ্রেণীসমূহের মধ্যে আয়গত পার্থক্য হ্রাস পেতে থাকবে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের এটাই কাঙ্খিত লক্ষ্য।

এ জন্যেই রাসূলে করীম (সা) যাকাত সুষ্ঠুভাবে আদায় ও বিলিবণ্টনের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সমগ্র জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বড় বড় গোত্রের নিকট হতে যাকাত আদায়ের জন্যে তিনি বিশিষ্ট সাহাবীদের নিয়োগ করেছিলেন। আদায়কৃত সমুদয় অর্থ, গবাদি পশু ও ফসল তিনি বিলি-বণ্টন করে দিতেন নিজের হাতে। তাঁর ইনতিকালের পরে ইসলাম বিরোধীরা যে সমস্ত দাবী নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল যাকাত না দিতে চাওয়া তার অন্যতম। ইসলামের মহান খলীফা হযরত আবু বকর (রা) কঠোরতার সাথে সেসব দাবী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বরং বলেছিলেন– যদি কারো কাছে উট বাঁধার রশি পরিমাণ যাকাত পাওনা হয় আর সে তা দিতে অস্বীকার করে তবে তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করবেন। তিনি এখানেই থেমে থাকেননি। রাসূলের (সা) অনুসরণে যথারীতি যাকাত আদায় ও বিলি-বণ্টনের জন্য আট পদের লোক নিয়োগ করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজও সেই যাকাত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম দেশেই এর আদায় ও বিলি-বণ্টন ব্যক্তি মুসলমানের খেয়াল-খুশীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় চাপ ও তদারকি না থাকার জন্যে যে পরিমাণ যাকাত আদায় হতে পারতো তা

যেমন হচ্ছে না তেমনি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা না থাকায় যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে যে কাংখিত ফল পাওয়া যেতে পারতো তাও পাওয়া যাচ্ছে না। যাকাত যেমন একধারে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত তেমনি জন্যকল্যাণের অন্যতম হাতিয়ার। এ জন্যেই এর আমল ব্যক্তির খেয়াল খুশীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। আজও যদি রাসূলে করীম (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদার (রা) অনুসৃত পথ যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায় তাহলে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও মঙ্গল অর্জন সম্ভব।

২. বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা

রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় যখন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন তখন একই সঙ্গে তিনি বায়তুল মালেরও প্রবর্তন করেন। বায়তুলমাল বলতে সরকারের অর্থ সম্বন্ধীয় কর্মকাণ্ডকে বুঝায় না। বরং বিভিন্ন উৎস হতে অর্জিত ও রাষ্ট্রের কোষাগারে জমাকৃত ধন-সম্পদকেই বায়তুলমাল বলা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই সম্মিলিত মালিকানা রয়েছে এতে। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা রাজকীয় ধনাগারের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ভাষা নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের সাধারণ অধিকার এতে স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে একজন লোকও যেন মৌলিক প্রয়োজন হতে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা করা বায়তুল মালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব।

প্রত্যেক নাগরিকই তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ ন্যূনতম অর্থ বা সম্পদ বায়তুলমাল হতে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করেও যদি জীবিকার অভাব পূরণ না হয় বা সমাজের স্বচ্ছল লোকজন তাদের দরিদ্র আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করার পরও মৌলিক প্রয়োজন অপূর্ণ থেকে যায় তবেই মাত্র বায়তুলমাল হতে সাহায্য গ্রহণ করা উচিৎ হবে। ইসলামী অর্থনীতিতে এভাবেই সমস্ত নাগরিকের জন্যে আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা

হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই জাতীয় ব্যবস্থা শুধু প্রথমই নয়, মৌলিকও নিঃসন্দেহে।

ইসলামী ফিকাহ ও শরীয়ত অনুযায়ী বায়তুলমালে অর্থ সংস্থানের উৎসগুলি নিম্নরূপ–

ক. অর্থ সম্পদ ও গবাদি পশুর যাকাত;

খ. সদাকায়ে ফিতর;

গ.কাফফারাহ;

ঘ. ওশর/ওশরের অর্ধেক;

ঙ. খারাজ;

চ. গণীমতের মাল ও ফাই[১]

ছ. জিজিয়া।

জ. খনিজ সম্পদের আয়[২]

ঝ. নদী ও সমুদ্র হতে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ;

ঞ. ইজারার খাজনা;

ট. মালিক ও উত্তরাধিকারহীন সম্পদ;

ঠ. আমদানী ও রফতানী শুল্ক;

ড. রাষ্ট্রের মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীন জমি, বন, ব্যবসায় ও শিল্পের মুনাফা;

ঢ. শরীয়ত মুতাবেক আরোপিত কর এবং

ণ. বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের অনুদান ও উপঢৌকন।

---

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুজাহিদদের জন্যে কোন নির্দিষ্ট বেতন ছিল না। এ জন্যে গণমিতের মাল ও ফাইয়ের চার-পঞ্চমাংশ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো। বাকী এক-পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা হতো। পরবর্তীকালে যেহেতু সৈনিকদের বেতন নির্দিষ্ট করা হয় এবং বায়তুলমাল হতেই তা দেবার ব্যবস্থা করা হয় সেহেতু সমুদয় গণীমতের মাল ও ফাই বায়তুলমালে জমা হতো।

২. অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রেই খনিজ সম্পদ সরকারের তথা রাষ্ট্রের অধীনে। তাই এ ক্ষেত্রেও সমুদয় আয়ই বায়তুলমালে জমা হওয়া বিধেয়।

বায়তুলমালের আয় বৃদ্ধির জন্যে উল্লেখিত উৎসসমূহকে অবশ্যই পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। এই সমস্ত উৎস হতে যথাযথভাবে অর্থাগম নিশ্চিত করা এবং সুষ্ঠ বন্টনের উদ্দেশ্যে মহান খুলাফায়ে রাশিদীনের (রা) আমলে যথেষ্ট সতর্কতা ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ যাকাতের কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে। যাকাত আদায় ও বন্টনের জন্যে সেই সময়ে সরকারী উদ্যোগেই একটি বলিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী হয়েছিল যা আজকের যে কোন উন্নতমানের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ থেকেই বোঝা যায়, যাকাত বায়তুলমালের কত বড় গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এই প্রতিষ্ঠানে নিম্নবর্ণিত আট শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। এরা হচ্ছে–

ক. সায়ী= গবাদি পশুর যাকাত সংগ্রাহক;

খ. ক্কাতিব= কারণিক;

গ. ক্কাসাম= বন্টনকারী;

ঘ. আশির= যাকাত প্রদানকারী ও যাকাত প্রাপকদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকারী;

ঙ. আরিফ= যাকাত প্রাপকদের অনুসন্ধানকারী;

চ. হাসিব= হিসাব রক্ষক;

ছ. হাফিজ= যাকাতের বস্তু ও অর্থ সংরক্ষক এবং

জ. ক্কায়াল= যাকাতের পরিমাণ নির্ণয় ও ওজনকারী।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যাকাতের অর্থ বিশেষ কোন সমস্যা মুকাবিলার জন্যে বিশেষ কোন সময়ে সবকটি খাতে বন্টনের পরিবর্তে মাত্র একটি খাতেও ব্যয়ের বিধান রয়েছে। যাকাত গ্রহণ করতে পারে এমন আট শ্রেণীর লোক ছাড়াও যে সমস্ত খাতে বায়তুলমালের অর্থ ব্যয়ের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে সেগুলি হচ্ছে :

---

১. S. A. Siddique-*Public Finance in Islam* (Lahore: Sh.Muhammad Ashraf; 1962 p.160)

ক. রাষ্ট্র প্রধানের বেতন;

খ. সরকারী কর্মচারীদের বেতন;

গ. বন্দী ও কয়েদীদের ভরণ-পোষণ;

ঘ. লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন;

ঙ. অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা;

চ. করযে হাসানা প্রদান এবং

ছ. সমাজকল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

ক. রাষ্ট্র প্রধানের বেতন : ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান তাঁর বেতন বায়তুলমাল হতেই নেবেন। তবে এর পরিমাণ হবে তাঁর প্রয়োজন ও সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্য অনুসারে সাধারণ প্রচলিত হারের সমান। এ ক্ষেত্রে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন–

"তোমাদের সামগ্রিক ধনসম্পদ এতিমের ধনসম্পদের সমতুল্য এবং আমি যেন এতিমের মালেরই রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আমি যদি ধনী হই– অভাবী না হই, তবে বায়তুলমাল হতে কিছুই গ্রহণ করব না। আর যদি দরিদ্র ও অভাবী হই, তবে অপরিহার্য পরিমাণ কিংবা সাধারণ প্রচলিত মানের বেতনই আমি গ্রহণ করব।" (আবু ইউসুফ–কিতাবুল খারাজ)

অথচ আজ বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহেরই রাষ্ট্রপ্রধানদের বার্ষিক বেতন ও বিভিন্ন এ্যালাউন্সের পরিমাণ সেসব দেশের রাষ্ট্রীয় কোষাগারের এক বিরাট অংশ। রাষ্ট্রপ্রধানগণ আকাশচুম্বি বেতন ছাড়াও নানা ধরনের এ্যালাউন্স ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এত বেশী পেয়ে থাকেন যে তার হিসেব করলে দেশের সাধারণ নাগরিদের সঙ্গে পার্থক্যের পরিমাণ ১০,০০০ : ১ হয়ে দাঁড়াবে। মধ্যপ্রাচ্যের সুলতান, শেখ বা আমীরদের কথা নাই বা বলা হলো। এর বিপরীতে রাষ্ট্রপ্রধান ও তাঁর মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের বেতনের ক্ষেত্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের (রা) নীতি অনুসরণ করলে দেখা যাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অবস্থাই শুধু উন্নত হচ্ছে না, দেশবাসীর মধ্যেও রাষ্ট্র প্রধান ও মন্ত্রীদের সম্বন্ধে একটা সশ্রদ্ধ মনোভাব ফুটে উঠছে।

খ. সরকারী কর্মচারীদের বেতন : ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের জন্যে "ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালনক্ষম বেতন নীতির" কথা বলা হয়েছে। নিম্নপদস্থ বা সাধারণ কর্মচারীদের ন্যূনতম প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে উচ্চপদস্থ অফিসারদের বিলাস-ব্যসনের ব্যবস্থার অনুমতি ইসলাম দেয়নি। বেতন নির্ধারণ সম্পর্কে হযরত উমর ফারুক (রা)-এর গৃহীত নীতি এ প্রসঙ্গে সবিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। সে নীতিতে মূখ্য বিচার্য বিষয় ছিল একজন ব্যক্তি–

ক. ইসলামের জন্যে কি পরিমাণ দুঃখ ভোগ করেছে;

খ. ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে কতখানি অগ্রসর হয়েছে;

গ. ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কতখানি কষ্ট স্বীকার করেছে;

ঘ. ইসলামী জীবন যাপনের জন্যে প্রকৃত প্রয়োজন কতখানি এবং

ঙ. কতজন লোকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত রয়েছে।

এ সব প্রশ্নের উত্তরের আলোকেই ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারীদের বেতন নির্ধারিত হতো এবং বায়তুলমাল হতেই সে বেতন দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল। সরকারী কর্মচারীদের বেতন নিয়ে আজ সর্বত্রই অসন্তোষ ও নানা বিশৃংখলা সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের বিধানসমূহকে আদৌ লক্ষ্য করা হচ্ছে না। বর্তমান প্রচলিত বেতন ব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটি হচ্ছে–

ক. দেয় বেতনে কর্মচারীর নিজেরই ভরণ-পোষণ চালানো অসম্ভব;

খ. বেতনের হার নির্ধারণের ব্যাপারে চাকুরীজীবীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও পোষ্যদের সম্পর্কে বিবেচনা করা হয়নি এবং

গ. বিভিন্ন ধরনের স্কেল তৈরী করে স্কেল হতে স্কেলে অবিচারমূলক ও স্বেচ্ছাকৃত পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়।

এই বেতন নীতির ফলেই নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের মনে রাষ্ট্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধভাবের ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। উপরন্তু তারা নিজেদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্যে ঘুষ ও নানা দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। অপর দিকে উচ্চ বেতনভুক কর্মচারীদের মধ্যে বিলাসিতা, অপচয় ও

স্বেচ্ছাচারিতার প্রবণতা দেখা দেয়। যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এ অবস্থা ক্ষতিকর। দেশের উন্নতি ও কল্যাণের পক্ষেও মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

গ. বন্দী ও কয়েদীদের ভরণ-পোষণ : বর্তমানের এই সভ্য যুগেও বন্দী ও কয়েদীদের সঙ্গে যে অমানুষিক আচরণ করা হয়ে থাকে তা কারো অবিদিত নয়। এদের ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটানো হয় না। বরং নির্মম ব্যবহারের শিকার হয়ে থাকে তারা। এর প্রতি বিধানের জন্যে এ্যামেনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালকে দেশ থেকে দেশান্তরে সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন জানিয়েও বিফল হতে হয়। ক্ষুৎপিপাসায়, বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে ধুঁকে ধুঁকে মারা যায় বন্দীরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বা বন্দী শিবিরগুলিতে। অথচ এদের প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণ ও চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারেরই।

এই দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্রে বায়তুলমাল হতেই খরচের বিধান রয়েছে। যুদ্ধবন্দী ও বিভিন্ন অপরাধের কয়েদীদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে সে যুগে ইসলামী সরকার বাধ্য ছিল। রাসূলে কারীম (সা) ও খুলাফায়ে রাশিদীন (রা) বন্দী ও কয়েদীদের সঙ্গে যে অপূর্ব মহিমা সুন্দর ব্যবহার করেছেন দুনিয়ার ইতিহাসে তার নজীর বিরল। ইসলামী রাষ্ট্রে যখন এই নীতি অনুসৃত হতো তখন পাশাপাশি রোমান ও বাইজেন্টাইন শাসকবর্গ তাদের যুদ্ধবন্দী ও কয়েদীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করতো তা ছিল যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি হৃদয়-বিদারক। খাজনা অনাদায়ের জন্যে শত শত নিরীহ কৃষককে, শত শত কয়েদীকে মাটির নীচে স্বল্প পরিসর ঠান্ডা কুঠুরীতে অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হতো। ইসলাম-এর প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হয়নি, প্রতিবিধানের জন্যে সরাসরি বায়তুলমাল হতে ব্যয়েরও বিধান রেখেছে।

ঘ. লা-ওয়ারিশ শিশুদের প্রতিপালন : এতিম, অনাথ ও লা-ওয়ারিশ শিশুদের লালন পালন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। মনে রাখা দরকার, যে সমাজে এতিমের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ ছিল সাধারণ ঘটনা সে সমাজেই ইসলামী বিপ্লবী চেতনার ফলে লা-ওয়ারিশ শিশুরা রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়েছিল। তাদের লালন-পালন ও জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব

রাষ্ট্রের হাতেই ছিল ন্যস্ত। বায়তুলমাল হতেই এই ব্যয়ভার বহন করার বিধান ছিল। অমুসলিমদের লা-ওয়ারিশ সন্তানদের সম্পর্কেও এই একই নীতি অনুসৃত হতো।

ঙ. অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা : ইসলামী অর্থনীতির সামাজিক নিরাপত্তা শুধুমাত্র মুসলিম নাগরিকদের জন্যেই নয়, জাতি ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই এই নিরাপত্তা লাভ করবে। বিধর্মীরা অক্ষম অবস্থায় জিযিয়া তো দেবেই না, বরং রাষ্ট্রই তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে বায়তুলমাল হতে। এ প্রসঙ্গে ভিক্ষারত বৃদ্ধ ইহুদী সম্পর্কে খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা)-এর উক্তি স্মরণযোগ্য। পৃথিবীর যে কোন দেশের, যে কোন জাতির জন্যে সে বক্তব্য শুধু স্মরণীয় নয়, পালনীয় হওয়াও উচিৎ। তিনি বলেছিলেন–

"খোদার শপথ, এর যৌবন শক্তিকে আমরা কাজে ব্যবহার করবো, আর বার্ধক্যের অক্ষম অবস্থায় অসহায় করে ছেড়ে দেব– এটা কোন মতেই ইনসাফ হতে পারে না।" (আবু ইউসুফ–কিতাবুল খারাজ)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি হতে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন নাগরিক যখন দরিদ্র হয়ে পড়বে, বৃদ্ধ হয়ে উপার্জন ক্ষমতা হারাবে তখন তার যাবতীয় প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্রের উপর নাগরিকদের এই অধিকার ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক। ইসলামী অর্থনীতি এই ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক দাবীকে স্বীকার করে।

চ. করযে হাসানা প্রদান : আইয়ামে জাহেলিয়াত বা তার পূর্ববর্তী যুগে বিনা প্রতিদানে ঋণ দেবার নীতি চালু ছিল না। বরং সুদই ছিল লেনদেনের ভিত্তি। রাসূলে কারীম (সা) প্রচলিত এই নীতির মূলোচ্ছেদ করেন এবং অর্থনীতিতে বিনা সূদে ঋণ বা করজ দেবার রীতি চালু করেন। এই ঋণকেই করযে হাসানা বলা হয়েছে। সুদমুক্ত অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্যে এ ছিল একটি বলিষ্ঠ ও প্রত্যয়দৃঢ় পদক্ষেপ। বিশ্বে প্রচলিত আর কোন ধরনের অর্থনীতিতে এই অবস্থা পূর্বেও ছিল না, আজও নেই। বিশেষ করে তৎকালীন অর্থনীতিতে এ ছিল এক বিপ্লবী ব্যবস্থা।

ঋণগ্রহণ লোকের জন্যে একটি অপরিহার্য ব্যাপার। এই চাহিদা পূরণের জন্যে পরবর্তী সময়ে বায়তুলমাল হতেই করযে হাসানা দেয়ার রীতি চালু হয়। ঐ সময়ে ব্যক্তিগত, সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যেমন ঋণ দেয়া হতো তেমনি নানা ধরনের উৎপাদনী ও ব্যবসায়ী ঋণ দেয়ার প্রচলনও ছিল। বস্তুতঃ সমাজে উৎপাদনী ও অনুৎপাদনী দুই ধরনের ঋণেরই প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্রও তার ব্যতিক্রম নয়। আর এই উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন পূরণের জন্যে বায়তুলমালের একটি নির্দিষ্ট অংশ আজও বরাদ্দ থাকতে পারে।

ছ. সমাজকল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন : সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন হতে পারে এমন সব কাজে বায়তুলমাল হতেই অর্থ ব্যয় করার বিধান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বায়তুলমালের অর্থেই সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ ও সেবামূলক কাজ সম্পন্ন হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই অর্থেই জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে কাজ করা হতো। সরাইখানা নির্মাণ, শিক্ষা বিস্তার, জলপত্র স্থাপন, পানির নহর খনন, জনগণের চিকিৎসা প্রভৃতি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এ যুগেও শিক্ষার সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থার বিস্তার, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ পদ্ধতির ব্যাপক সম্প্রসারণ, পথিকদের সুবিধার বন্দোবস্ত সবই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিনামূল্যে নির্দিষ্ট একটা স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদান, রাস্তাঘাট, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ, খাল, কূপ ও পুষ্করিণী খনন সবই সমাজ-কল্যাণের আওতাভুক্ত। মুসাফিরখানা স্থাপন, ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ, বাসস্থান সমস্যার সমাধান, পুষ্টিহীনতা দূর, শ্রমিক কল্যাণ প্রভৃতিও সরকারের দায়িত্ব। এসব দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে বায়তুলমালের অর্থ ও সম্পদ হবে সবচেয়ে বড় সহায়ক।

অতএব, একথা স্বীকার্য যে, বায়তুলমালের অর্থ সম্পদ জনগণের প্রয়োজন, সামাজিক কল্যাণ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও উন্নয়ন এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের জন্য ব্যবহৃত হবে। ফলশ্রুতিতে একটি অভাবমুক্ত সুখী সমাজ ও আধুনিক কল্যাণমুখী ও সমৃদ্ধশালী ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। অতীতে যা সম্ভব ও বাস্তব ছিল আজও তার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব নয়।

৩. উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন ও স্বাভাবিকিকরণ

শুধু আরব ভূখণ্ডেই নয়, রাসূলে কারীমের (সা) আবির্ভাবের পূর্বে সারা বিশ্বে ভূমির উত্তরাধিকার আইন ছিল অস্বাভাবিক। তখন পর্যন্তও উত্তরাধিকারের মূলনীতি ছিল–"জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ" বা Law of Primogeniture. এর ফলে পুরুষানুক্রমে পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তানই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব লাভ করতো। বঞ্চিত হতো পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এছাড়া যৌথ পরিবার প্রথা বা joint family system সমাজে চালু ছিল। এ প্রথার মূল বক্তব্য হচ্ছে সম্পত্তি গোটা পরিবারের হাতেই থাকবে। পরিবারের বাইরে তা যাবে না। অর্থাৎ মেয়েরা বিয়ের পর পিতার সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হতো। উপরন্তু সম্পত্তির কর্তৃত্ব বা ব্যবস্থাপনার ভার জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তানের হাতেই ন্যস্ত থাকত। এই দু'টি নীতিই হিন্দু, খ্রীষ্টান ও ইহুদী ধর্মে অনুসৃত হয়ে আসছিল যুগ যুগ ধরে। সম্পত্তি যেন বিভক্ত না হয় তার প্রতি এসব ধর্মের ছিল তীক্ষ্ণ নজর। কারণ, সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গেলে পুঁজির পাহাড় গড়ে উঠবে না, গড়ে উঠবে না বিশেষ একটি ধনিক শ্রেণী যারা অর্থবলেই সমাজের প্রভুত্ব লাভ করবে। এরাই নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অত্যাচার, অবিচার, অনাচার ও নানা ধরনের সমাজ বিধ্বংসী কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে।

ইসলামের অভ্যুদয় এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বয়ং আল্-কুরআনে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের আইন ও নীতিমালা ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىٓ أَوْلَادِكُمْ–لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ– فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ– وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ– وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ– فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ– فَإِنْ كَانَ لَهٗٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ– مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ

أَوْ دَيْنٍ- اٰبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا-
فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ- إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا-

وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ- فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ- وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ- فَإِنْ كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ- وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهٗ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَارٍّ-وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ- وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ-

অর্থ : "তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে আল্লাহ এই বিধান দিচ্ছেন যে, এক পুত্র দুই কন্যার সমান অংশ পাবে। আর যদি পুত্র না থেকে দুই কিংবা অধিক কন্যা থাকে, তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন অংশের দুই অংশ পাবে। আর যদি এক কন্যা হয়, তবে সে অর্ধেক অংশ পাবে। আর সন্তান থাকলে মাতা-পিতা প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে; আর সন্তান না থাকলে এবং শুধুমাত্র মাতা-পিতাই উত্তরাধিকারী হলে মা তিন ভাগের এক ভাগ পাবে; একাধিক ভাই-বোন থাকলে মা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে–অসিয়ত ও ঋণ শোধের পর। আল্লাহ্ এই বিভাগ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব জানেন, সব বুঝেন। তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে যায়, তোমরা তার অর্ধেক পাবে যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তোমরা তার চার ভাগের এক ভাগ পাবে–তাদের অসিয়ত ও ঋণ শোধের পর। আর তোমরা যা রেখে যাও তোমাদের স্ত্রীরা তার চার ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তোমাদের সন্তান না থাকে; কিন্তু যদি তোমাদের সন্তান থাকে তবে তোমাদের স্ত্রীরা

আট ভাগের এক ভাগ পাবে– তোমাদের অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। আর যার সম্পত্তি বন্টন হয় সে পুরুষই হোক কিংবা নারীই হোক যদি সে কালালা হয়, এবং তার (বৈপিত্রেয়) এক ভাই বা এক বোন থাকে তবে তারা প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে। যদি তারা এর বেশী হয় তবে সকলে মিলে তিন ভাগের এক ভাগ পাবে– সে যে অসিয়ত ও ঋণ রেখে গেছে তা পরিশোধের পর (যদি তা ক্ষতিকর না হয়)। এটাই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ জ্ঞানী এবং উদার।" (সূরা আন-নিসা : ১১-১২ আয়াত।)

উপরের আয়াত দুটিতে পিতার বা পরিবারের কর্তার মৃত্যুর পর শুধু সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার বন্টনের নীতিমালা বর্ণিত হয়নি, বরং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও সম্পত্তি বন্টনের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। উপরন্তু ইসলামেই সর্বপ্রথম সম্পত্তিতে নারীকে মাতা হিসেবে, ভগ্নী হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, কন্যা হিসেবে অধিকার দান করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ছিল এক দারুণ বৈপ্লবিক ব্যাপার। আল্লাহর দেয়া এই অধিকার ও উত্তরাধিকার বন্টনের নীতিমালা খুবই নিখুঁত ও বাস্তবসম্মত। বহু শতাব্দী পরে এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রিমজে তাঁর 'মোহামেডান ল' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন– "আধুনিক সভ্য পৃথিবী ধন বন্টনের যত নিয়ম ও পথ আবিষ্কার করেছে, ইসলামের উত্তরাধিকার আইন তার মধ্যে সবচেয়ে অধিক বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভুল। এই আইনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও নিখুঁত সামঞ্জস্য অপরিসীম।"

এখানেই শেষ নয়। ইসলাম যে কোন রকম বঞ্চনার বিরুদ্ধে শুধু সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠই নয়, তার প্রতিবিধানের জন্যেও পথ নির্দেশ করেছে। পুঁজিবাদী সমাজে উইল করে কোন বিত্তশালী মানুষ যে কোন উদ্দেশ্যে তার সমুদয় সম্পত্তি দান করে যেতে পারে। বিশেষ করে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ নির্দেশ বা অসিয়তের সামাজিক ও আইনগত মূল্য খুবই বেশী। এর সুযোগ নিয়ে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে তার সর্বস্ব দান করে যায় ইচ্ছা মতো যে কাউকে, ক্ষেত্র বিশেষে কুকুর, বিড়াল বা পাখীর জন্যে। এর পরিমাণ লক্ষ লক্ষ ডলার হয়ে থাকে। এমনও নজীর রয়েছে, একদিকে পুত্র-কন্যারা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পথে পথে ঘোরে, আর একদিকে

কুকুর-বিড়ালের জন্যে থাকে মাইনে করা ম্যানেজার। এ নিয়ম স্বাভাবিকতার পরিপন্থী। তাই ইসলামে অসিয়ত করারও সীমা নির্দেশ করা হয়েছে।

কোন ব্যক্তি অসিয়ত করতে পারে তার সম্পত্তির সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত। তার বেশী নয়। করলেও তা ইসলামী আইনে সিদ্ধ হবে না। এই অসিয়তও কার্যকর হবে মৃতের যদি কোন ঋণ বা কর্জ ও কাফফারা থেকে থাকে তবে তা পরিশোধের পর। এ বিধান ছিল সম্পত্তির এককেন্দ্রীকরণ বা পুঞ্জিভূতকরণ নিরোধের ক্ষেত্রে এক মোক্ষম ব্যবস্থা। অধিকন্তু মানুষের খেয়াল-খুশীর উপর তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারত্ব ছেড়ে দেয়া হয়নি।

৪. মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন

ইসলামী অর্থনীতিতেই সর্বপ্রথম মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন হয়। তার পূর্বে এই জাতীয় প্রয়াস গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি পরেও কোন দেশে বা আইন -পদ্ধতিতে সমতুল্য কোন নীতি গৃহীত হয়নি। আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইসলাম প্রবর্তিত শ্রমনীতি আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শ্রমনীতি। প্রচলিত দুটি সমাজ ব্যবস্থা—পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এ ব্যাপারে একে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করলেও বাস্তবে এই দুই ব্যবস্থায় শ্রমিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ লেগেই রয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে এ দুটি সমাজ ব্যবস্থায় অনুসৃত শ্রমনীতি মানবিক নয়, ইনসাফভিত্তিক তো নয়ই। এ কারণেই হরতাল, ধর্মঘট, লক আউট, বিক্ষোভ প্রভৃতি অহরহ লেগেই রয়েছে।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যবহার, তাদের বেতন ও মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে রাসূলে কারীমের (সা) প্রদর্শিত পথ ও হাদীসসমূহ থেকেই ইসলামের বৈপ্লবিক ও মানবিক শ্রমনীতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে। মজুরদের অধিকার সম্বন্ধে তিনি বলেন—

“তারা (মজুর, অধীনস্থ বেতন ভোগী কর্মচারী) তোমাদের ভাই, আল্লাহর তাদের দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন। কাজেই আল্লাহ যাদের উপর এরূপ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন তাদের কর্তব্য এই যে, তারা যে রকম খাবার খাবে তাদেরকেও সেরকম খাবার দেবে, তারা যা পরিধান

করবে তাদেরও তা পরবার ব্যবস্থা করে দেবে। আর যে কাজ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর ও সাধ্যাতীত তা করার জন্যে তাদেরকে কখনও বাধ্য করবে না। সে কাজ যদি তাদের দিয়েই করাতে হয় তা হলে সেজন্যে তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে হবে।" (বুখারী; কিতাবুল ঈমান)

অন্যত্র রাসূলে কারীম (সা) শ্রমিকদের সম্পর্কে বলেছেন- "শ্রমিককে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না, যা তাদেরকে অক্ষম ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেবে।" (তিরমিযী)

"তাদের উপর অতখানি কাজেরই চাপ দেয়া যেতে পারে, যতখানি তাদের সামর্থ্যে কুলায়। সাধ্যাতীত কোন কাজের নির্দেশ কিছুতেই দেয়া যেতে পারে না।" (মুওয়াত্তা, মুসলিম)

মজুরদের বেতন, উৎপাদিত পণ্যের তাদের অংশ ইত্যাদি সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন-

"মজুরের মজুরী তার গায়ে ঘাম শুকোবার পূর্বেই পরিশোধ কর।" (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

মজুরের বেতন নির্দিষ্ট না করে তাকে কাজে নিযুক্ত করতে রাসূল (সা) নিষেধ করেছেন। (বায়হাকী)

"মজুর-শ্রমিক-ভৃত্যদের যথারীতি খাদ্য ও পোশাক দিতে হবে।"
(মুওয়াত্তা, মুসলিম)

"মজুরকে তার কাজ হতে অংশ দান কর। কারণ, আল্লাহর মজুরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যেতে পারে না।" (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল)

উপরোক্ত হাদীসসমূহ হতে যে সব মূলনীতি পাওয়া যায় সেগুলোই শ্রমিকদের জন্যে রাসূলে কারীম (সা) কর্তৃক প্রবর্তিত মানবিক শ্রম-নীতি। সংক্ষেপে সেগুলো হচ্ছে-

ক. উদ্যোক্তা বা শিল্প মালিক মজুর-শ্রমিককে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করবে। সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এ ক্ষেত্রেও সে রকম সম্পর্ক থাকবে।

খ. অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই মান সমান হবে। মালিক যা খাবে ও পরবে শ্রমিককেও তাই খেতে ও পরতে দেবে।

গ. সময় ও কাজ উভয় দিক দিয়েই শ্রমিকদের সাধ্যমতো দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে, তার বেশী নয়। শ্রমিককে এত বেশী কাজ দেয়া উচিৎ হবে না যাতে সে ক্লান্ত ও পীড়িত হয়ে পড়ে। এত দীর্ঘ সময় পর্যন্তও তাকে শ্রম দিতে বাধ্য করা যাবে না, যার ফলে সে অক্ষম হয়ে পড়বে। শ্রমিকের কাজের সময় নির্দিষ্ট হতে হবে এবং বিশ্রামের যথেষ্ট সুযোগ থাকতে হবে।

ঘ. যে শ্রমিকের পক্ষে একটি কাজ করা অসাধ্য তা সম্পন্ন হবে না এমন কথা ইসলাম বলে না। বরং সে ক্ষেত্রে আরও বেশী সময় দিয়ে বা বেশী শ্রমিক নিয়োগ করে তা সম্পন্ন করা যেতে পারে।

ঙ. শ্রমিকদের বেতন শুধুমাত্র তাদের জীবন রক্ষার জন্যে যথেষ্ট হলে হবে না। তাদের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সজীবতা রক্ষার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ভিত্তিতেই বেতন নির্ধারণ করতে হবে।

চ. উৎপন্ন দ্রব্যের অংশবিশেষ বা লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশ ও শ্রমিকদের দান করতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, শিল্প বিপ্লবেরও বহু শতাব্দী পূর্বে রাসূলে কারীম (সা) এই নীতি গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দেন। বর্তমান বিশ্বের সকল বৃহৎ শিল্প-কলকারখানাতে এই নীতি কোন-না-কোন রূপে চালু রয়েছে। এর ফলে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মকুশলতা বৃদ্ধির পথকে সুগম করে দিয়েছে। একজন শ্রমিক তার শ্রমের ন্যায্য মজুরী পেলে উৎপাদনের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতি সে যত্নবান হবে, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতিও সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করবে, পরিণামে কল-কারখানার মুনাফার পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে।

ছ. শ্রমিকদের কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে তাদের প্রতি অমানুষিক আচরণ বা নির্যাতন করা চলবে না। বরং সেক্ষেত্রেও যথাসম্ভব সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করাই উচিত।

জ. চুক্তিমত কাজ শেষ হলেই অথবা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে শ্রমিককে দ্রুত মজুরী বা বেতন পরিশোধ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন ওজর-আপত্তি বা গাফলতি করা চলবে না।

ঝ. পেশা বা কাজ নির্বাচন করার ও মজুরীর পরিমাণ বা হার নির্ধারণ সম্পর্কেও দর-দস্তুর করার পূর্ণ স্বাধীনতা ও অধিকার শ্রমিকের রয়েছে। মজুরী ও কাজের সময় পূর্বেই স্থির করে নিতে হবে। উপরন্তু শ্রমিকদের বিশেষ কোন কাজে বা মজুরীর বিশেষ কোন পরিমাণের বিনিময়ে কাজ করতে জবরদস্তি করা যাবে না।

ঞ. কোন অবস্থাতেই মজুরদের অসহায় করে ছেড়ে দেয়া চলবে না। তারা অক্ষম ও বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তাদের জন্যে ভাতার ব্যবস্থাও করতে হবে। এ কাজের জন্যে বায়তুল মালের তহবিল ব্যবহৃত হতে পারে।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেয়াও ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাসূলে কারীম (সা) নিজে কর্মচারী ও ভৃত্যদের স্বাস্থের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। হযরত উমর ফারুক (রা) তাঁর খিলাফতের বিভিন্ন বিভাগে ও বিভিন্ন অঞ্চলে অসুস্থ কর্মচারীদের শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় কিনা তার খোঁজ রাখতেন।

উপরে বর্ণিত নীতিমালার আলোকে দ্বিধাহীন চিত্তে একথা বলা যেতে পারে যে, ইসলামী অর্থনীতিতে মজুরের যে মর্যাদা ও অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক সৃষ্টির নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের অবকাশই থাকে না। দুইয়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার ফলে শিল্পের ক্রমাগত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক। সর্বোপরি মুমিন মুসলমান শিল্প-মালিক ও উদ্যোক্তারা ঈমানের তাগিদে ও পরকালের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই এই শ্রমনীতি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে, অন্য কোন ধরনের অর্থনীতিতে যা প্রত্যাশা করা একেবারেই অসম্ভব। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'– শ্লোগান সর্বস্ব সমাজতন্ত্রের বাধ্যতামূলক শ্রমদান যেমন এখানে অনুপস্থিত, তেমনি পুঁজিবাদের মালিকের অবমাননাকর শর্ত ও

লাগামহীন শোষণও নেই। শ্রমিক ও মালিক পরস্পর ভাই– এই বিপ্লবাত্মক ঘোষণাই ইসলামী শ্রম-নীতির মূল উপজীব্য। জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এখন পর্যন্ত এই নীতি গ্রহণের বা স্বীকারের সৎ সাহস দেখাতে পারেনি।

৫. ভূমি রাজস্ব ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন :

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পূর্ব পর্যন্ত আরব ভূখণ্ডে তথা তদানীন্তন বিশ্বেই ভূমি রাজস্বের কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিল না। রাসূলে কারীম (সা) এই অবস্থার প্রবর্তন করেন। সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের জন্যে তিনি একটি নির্দিষ্ট হারে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। ইনসাফ ও ন্যায়-নীতির দিক থেকে আজও তার সমকক্ষ কোন ভূমি রাজস্ব নীতি অন্য কোন মতাদর্শে প্রণীত হয়নি।

ইসলাম পূর্ব যুগে বিত্তশালী মানুষেরা তাদের ধন-সম্পদ হতে দরিদ্র ভুখা-নাঙ্গাদের মধ্যে দয়ার দান হিসেবে কখনও কখনও কিছু অর্থ দান করলেও উৎপন্ন ফসলের বা ফলমূলের অংশ বিশেষ দান করতো না। অথচ ফলমূল ও ফসল দিয়েও দরিদ্র ও অভাবীজনকে সাহায্য করা সম্ভব। অনেকের পক্ষেই মৌসুমী ফল কিনে খাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু তাদেরও তো এসব খাবার আকাংখা রয়েছে। মানবতার ধর্ম ইসলামে তাই ফসল ও ফলমূলে যে আল্লাহ হক রয়েছে তথা সমাজের বঞ্চিত ও অভাব-অনটনগ্রস্ত লোকদের অধিকার রয়েছে তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধন-সম্পদের উপর যেমন যাকাত আদায়ের বিধান দিয়েছেন তেমনি কৃষি ফসলের উপরও তার হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যাকাতের অর্থ যাদের প্রাপ্য ফসলের এই হকও তাদের প্রাপ্য। আলকুরআনে ইশরাদ হয়েছে :

وَهُوَ الَّذِي اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ز وَلَاتُسْرِفُوْا ط اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ - (الانعام : ١٤١)

অর্থ : তোমরা এগুলোর ফল ও ফসল খাও যখন ফল ধরে এবং আল্লাহর হক আদায় করো ফসল কাটার (বা আহরণ করার) দিন। (সূরা আল আনআম : আয়াত-১৪১)

কৃষি কাজের উপযুক্ততার দিক থেকে জমির দুটি শ্রেণী রয়েছে– সেচবিহীন ও সেচযুক্ত। প্রথমোক্ত ভূমি আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বৃষ্টির পানিতেই সিক্ত হয়। অন্যটিতে মানুষ কায়িক শ্রম, পশুশ্রম বা যন্ত্রের সাহায্যে পানি সেচ করে কৃষি কাজের উপযুক্ত করে নেয়। এই উভয় ধরনের জমির রাজস্বের ব্যাপারে রাসূলে কারীম (সা) যে ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন তা নিম্নরূপ–

"মুসলমান জমি হতে রাজস্ব বাবদ এক দশমাংশ আদায় করবে। এই পরিমাণ ফসল সেই সব জমি হতে গ্রহণ করা হবে যা বৃষ্টি বা ঝর্ণার (স্বাভাবিক) পানিতে সিক্ত হয়। কিন্তু যেসব জমিতে স্বতন্ত্রভাবে পানি সেচ করতে হয় সেসব হতে এক দশমাংশের অর্ধেক রাজস্ব বাবদ আদায় করতে হবে।" (তারীখ-ই-তাবারী, ফতহুল বুলদান)

এই নির্দেশ হতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে, প্রতিটি মুসলিম তার জমিতে বছরে যা কিছু উৎপন্ন হোক না কেন তা থেকে উশর,[১] অর্থাৎ এক-দশমাংশ বা ক্ষেত্র বিশেষে উশরের অর্ধেক অর্থাৎ এক-বিংশতি অংশ বায়তুল মালে রাজস্ব হিসেবে জমা দেবে। এটাই তার ভূমির খাজনা। এই নির্দেশ থেকে আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যাবে। সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ইসলামী ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার বিপ্লবাত্মক মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমত : উশর কখনই এবং কোন অবস্থাতেই রহিত করা যাবে না। এর হারও চিরকালের জন্যে নির্দিষ্ট। এ থেকে কোন অবস্থাতেই কাউকে

---

১. ইসলামী আইন শাস্ত্রের পরিভাষায় ঐ সমস্ত জমিকে উশরী জমি বলা হয়ে থাকে যা বিজয়ী মুসলিম মুজাহিদদের যুদ্ধলব্ধ ভূমি, মুসলমান কর্তৃক আবাদকৃত অনাবাদী জমি, আরব ভূখণ্ডের সমস্ত জমি, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের জমি এবং উত্তরাধিকারহীন জিম্মিদের যে সমস্ত সম্পত্তি মুসলমানদের দখলে এসেছে।

(আবু ইউসুফ–কিতাবুল খারাজ)

অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে না। কিন্তু কোন মৌসুমে কমপক্ষে ত্রিশ মণ ফসল না উৎপন্ন হলে ঐ মৌসুমে উশর আদায় করতে হবে না।[২]

দ্বিতীয়ত : উশর আদায় হবে প্রতিটি ফসল হতেই। অর্থাৎ যেসব জমিতে বছরে দু'টি বা তিনটি ফসল হবে সেসব জমি হতে সেই ফসলের প্রত্যেকটি হতেই উশর আদায় করতে হবে। এর ফলে বায়তুল মালের সম্পদ বৃদ্ধিতে সক্ষম মুসলিমের অংশগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, পরোক্ষভাবে জাতি ও দেশেরই খেদমত করা হবে।

তৃতীয়ত : উশর আদায় করতে হবে ফসলের দ্বারাই। এ ব্যবস্থা কৃষক বা ভূমি মালিকের জন্যে খুবই অনুকূল। এতে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। কারণ, ভূমি রাজস্বের এই নীতির ফলে মোট উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট একটা অংশ খাজনা দিতে হয়। সুতরাং, ফসল কমই হোক আর বেশীই হোক, তা থেকে নির্দিষ্ট অংশ পরিশোধ করতে কৃষকের অসুবিধা বা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া, খাজনা নগদ টাকায় যদি হয় তাহলে কৃষকের অসুবিধা বা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতি বছর প্রত্যেক ফসলের দাম কখনও নির্দিষ্ট থাকে না। কোন বছর যদি বিশেষ কোন ফসল বেশী পরিমাণ উৎপন্ন হয় বা অন্য কোন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে মূল্য হ্রাস পায়, তাহলে নির্দিষ্ট আর্থিক খাজনা পরিশোধ করার জন্যে কৃষক অধিক পরিমাণে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হবে। এতে কৃষকের স্বার্থ ক্ষুণ্নই হবে।

লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের দেশে বছর শেষে খাজনা পরিশোধের নিয়ম প্রচলিত। কৃষকের গোলায় তখন ফসল থাকে না। তাই সম্পূর্ণ সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে খাজনা পরিশোধ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিদ্যমান আর্থিক খাজনার হারও তার জন্যে দূর্বহ। নির্দিষ্ট কোন নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে এই খাজনা নির্ধারণ করা হয়নি। উপরন্তু খাজনার সঙ্গে নানা ধরনের ট্যাক্সও দিতে হয়। তা না হলে খাজনা গ্রহণ করা হয়

---

২. সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী- উশর (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২য় সংস্করণ, ১৯৯২ পৃঃ ১৫)

না। এই সঙ্গে ঘুষও দিতে হয় সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের। ফলে খাজনার চেয়ে বাজনাই হয়ে দাঁড়ায় বেশী। কৃষকের খাজনা পরিশোধের সামর্থ্য এতে একেবারেই হ্রাস পায়। পরিণামে তার জমি ক্রোক হয়, নীলামে চড়ে। এককালের মোটামুটি সচ্ছল কৃষক ভূমিহীন কৃষকদের কাতারে এসে দাঁড়ায়। অথচ উশর পদ্ধতিতে ভূমি রাজস্ব আদায় হলে আদৌ এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারতো না।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদেরও তাদের ভূমি ব্যবহার ও ভোগ-দখলের জন্যে নির্দিষ্ট হারে ভূমি রাজস্ব দিতে হয়। একে বলে 'খারাজ'। ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা, পানি সেচের প্রয়োজনীয়তা, ফসলের প্রকৃতি প্রভৃতি নিরূপণ করেই এবং অমুসলিম কৃষক প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে 'খারাজ' নির্ধারিত হবে। বছরে তা একবারই মাত্র দিতে হবে। রাষ্ট্রই নির্ধারণ করবে খারাজ কিভাবে আদায় হবে– ফসলে অথবা নগদ অর্থে। মুসলিম ও অমুসলিমদের ভূমি রাজস্বের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, মুসলমানগণ যেন বেশী করে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের জন্যে বায়তুল মালকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে এবং অমুসলিম নাগরিকরা যেন আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মতবাদ অনুযায়ী নানা ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ইউরোপে, বিশেষত ইংল্যাণ্ডে এই সেদিনও ভূমিদাসদের দ্বারা জমি চাষ-আবাদ করানো হতো। সাধারণ রায়তদের উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকেরও বেশী জমিদার ও চার্চের নামে আদায় করা হতো। ভূমির মালিকানা মাত্র গুটিকয়েক পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এরপর শিল্প বিপ্লবের ফলে জমির উৎপাদন যখন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, তখন বড় বড় শিল্পপতিরাও হাজার হাজার একর জমি খুবই সস্তায় কিনে একই সঙ্গে ভূস্বামী হয়ে বসে। উপরন্তু নব্য জমিদাররা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি হয় কিনে নেয় অথবা শক্তির দ্বারা চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করে। ফলে বেকার ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে জমিদারের সঙ্গে সঙ্গে জায়গীরদার, তালুকদার, কখনও মনসবদার, পীয়র, ব্যারণ, লর্ড, মার্কুইস প্রভৃতি ভূস্বামীদের শোষণও বাড়তে থাকে।

এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমাজতান্ত্রিক ভূমিস্বত্ত্ব নীতিতে জমির ব্যক্তি মালিকানা শুধু অস্বীকারই করা হয়নি, বরং ব্যক্তিকে জমি হতে উচ্ছেদ করা হয়েছে। সমস্ত জমি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র মালিকানায় আনা হয়েছে। কিন্তু তা বিনা রক্তপাতে শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করে হয়নি। বরং লক্ষ লক্ষ লোককে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়েছে আরও বহু সহস্রকে। নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে হাজার হাজার ভূস্বামীকে। তবেই জমি রাষ্ট্রয়াত্তকরণ করা সম্ভব হয়েছিল। উপরন্তু কৃষকদের এই রাষ্ট্রীয় ও যৌথখামারে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিনিময়ে অনেক সময় তাদের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত ন্যূনতম পারিশ্রমিকও জোটেনি। এই ব্যবস্থা শুধু অমানবিকই নয়, অস্বাভাবিকও।

এই উভয় প্রকার ভূমি ব্যবস্থাই আসলে বঞ্চনামূলক ও স্বভাববিরোধী। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজ ও জাতি বঞ্চিত, সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মানুষ শুধু বঞ্চিতই নয়, বরং শোষিত ও নিপীড়িত। এই অবস্থা যেন আদৌ সৃষ্টি না হয় সে জন্যে চৌদ্দশত বছর পূর্বেই ইসলাম তার অনন্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমি স্বত্বনীতি ঘোষণা করেছিল। আব্বাসীয় খিলাফত পর্যন্ত সে নীতি অনুসারে ভূমির বিলি-বন্টন ও মালিকানা নির্ধারিত হতো। ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে– ব্যক্তি ভূমির মালিকানা লাভ করবে। তবে নিরংকুশ মালিকানা তার নয়, তা একমাত্র আল্লাহরই। আল-কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ - يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ - وَالْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ .

অর্থ : জমি আল্লাহ তা'য়ালার। তাঁর বান্দাহদের মধ্যে থেকে তিনি যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারত্ব দান করে থাকেন। (সূরা আল-আরাফ : ১২৮ আয়াত)

রাসূলে কারীমের (সা) হাদীসও এই বক্তব্যকে সপ্রমাণ করে। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ (সা) চূড়ান্ত ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, জমি-জায়গা সব কিছুই আল্লাহর। মানুষ তাঁরই দাস। এতএব যে ব্যক্তি অনাবাদী জমি চাষ উপযোগী ও উৎপাদনক্ষম করে তুলবে তার মালিকানা লাভে সেই-ই অগ্রাধিকার পাবে।" (আবু দাউদ)

ইসলামী ভূমিস্বত্ব নীতি অনুযায়ী জমির মালিকানা লাভ ও ভোগ-দখলের দৃষ্টিতে জমিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হচ্ছে-

ক. আবাদী ও মালিকানাধীন জমি। মালিকের বৈধ অনুমতি ব্যতীত এই জমি অপর কেউ ব্যবহার বা অংশ দখল করতে পারবে না।

খ. কারো মালিকানাভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও পতিত আবাদ অযোগ্য জমি। এই জমিতে বসবাস নেই, কৃষি কাজ হয় না, ফলমূলেরও চাষ হয় না। এই শ্রেণীর জমিও মালিকেরই অধিকারভূক্ত থাকবে।

গ. জনগণের সাধারণ কল্যাণের জন্যে নির্দিষ্ট জমি। গবাদি পশুর জন্যে নির্দিষ্ট চারণ ভূমি, কবরস্থান, মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট জমি এই শ্রেণীর আওতাভুক্ত।

ঘ. অনাবাদী ও পরিত্যক্ত জমি- যার কোন মালিক নেই বা কেউ ভোগ-দখলও করছে না। এ ধরনের জমির বিলি-বণ্টন সম্পর্কে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

"অনাবাদী, অনুর্বর, মালিকহীন ও উত্তরাধিকারহীন জমি-জায়গা এবং যে জমিতে কেউ চাষাবাদ ও ফসল ফলানোর কাজ করে না তা ইসলামী রাষ্ট্রের উপযুক্ত লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ব্যাপারে সকল মুসলমানের সাধারণ ও নির্বিশেষ অধিকার স্বীকার ও সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনই নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।"

(আবু ইউসুফ-কিতাবুল খারাজ)

ইসলামী অর্থনীতিতে মাত্র একপ্রকার ভূমি স্বত্বই স্বীকৃত-রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি, ভূমি মালিকের সম্পর্ক। কারণ, পীয়র, মার্কুইস, লর্ড, জমিদার, তালুকদার, জায়গীরদার প্রমুখ মধ্যস্বত্বের কোন অবকাশই ইসলামী অর্থনীতিতে নেই। সে কারণেই শোষণও নেই। উপরন্তু রাজস্বের ক্ষেত্রে ওশর (ক্ষেত্র বিশেষে ওশরের অর্ধেক) ও খারাজ দেয়ার ব্যবস্থা থাকায় জমির মালিক বা কৃষকদের উপর ইনসাফ ও ইহসান করা হয়েছে। পৃথিবীর আর কোন ব্যবস্থাতেই এমন স্বাভাবিক ও সহজ নিয়ম আগেও ছিল না, এখনও নেই।

জমি পতিত রাখাকে ইসলাম সমর্থন করেনি। সে জমি রাষ্ট্রেরই হোক আর ব্যক্তিরই হোক। জমির মালিক যদি বৃদ্ধ, পংগু, দুর্বল, শিশু বা স্ত্রীলোক হয় অথবা নিজে চাষাবাদ করতে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ হয় তবে অন্যের দ্বারা জমি চাষ করাতে হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলে কারীমের (সা) নির্দেশ হচ্ছে–

"যার অতিরিক্ত জমি রয়েছে সে তা হয় নিজে চাষ করবে, অন্যথায় তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে অথবা তাকে চাষ করতে দেবে।" (ইবনে মাজাহ)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

"সেই জমি নিজেরা চাষ কর কিংবা অন্যদের দ্বারা চাষ করাও।" (মুসলিম)

উপরে বর্ণিত হাদীস দু'টির আলোকেই হযরত উমর ফারুক (রা) হযরত বিলাল ইবনুল হারেস (রা)-এর নিকট হতে রাসূলে কারীম (সা) প্রদত্ত জমির যে পরিমাণ তাঁর চাষের সাধ্যাতীত ছিল তা ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে পুনর্বন্টন করে দিয়েছিলেন।

বর্তমান সময়ে প্রতি ইঞ্চি জমি চাষের আওতায় আনবার জন্যে এক দিকে কিছু দেশ আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। অন্য দিকে ফসলের দাম কমে যাওয়ার ভয়ে হাজার হাজার একর জমি ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদী ও পতিত রাখা হচ্ছে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বিশ্বে খাদ্যের অনটন লেগেই রয়েছে। তাই জমি যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে অনাবাদী ও পতিত রাখা যাবে না তেমনি সমস্ত পতিত জমিও চাষের আওতায় আনতে হবে। ইসলামী অর্থনীতির দাবীই তাই। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পতিত জমি শুধু ব্যক্তিকে চাষ করতেই বলা হয়নি, উৎসাহ দেবার জন্যে ঐ জমিতে তার মালিকানাও স্বীকার করা হয়েছে। রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন–

"যে লোক পোড়ো ও অনাবাদী জমি আবাদ ও চাষযোগ্য করে নেবে সে তার মালিক হবে।" (আবু দাউদ)

ইচ্ছাকৃতভাবে জমি কিছুতেই অনাবাদী রাখার সুযোগ ইসলামী অর্থনীতিতে নেই। বরং জমি চাষের জন্যে এতদূর হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে কোন আবাদী জমি পর পর তিন বছর চাষ না করলে তা

রাষ্ট্রের দখলে চলে যাবে। রাষ্ট্রই তা পুনরায় কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দেবে।

উন্নত কৃষি ব্যবস্থার মূখ্য শর্ত হিসেবেই উন্নত ভূমি স্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া দরকার। এ জন্যে ইসলামী অর্থনীতির সেই প্রারম্ভিক যুগে বিশ্ব মানবতার কল্যাণকামী ও শান্তির পথিকৃৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং মহান খুলাফায়ে রাশেদীন (রা) আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে ভূমি স্বত্ব ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ছিলেন তা আজও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিধান। মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক– যে কোন দিক দিয়েই এর সমকক্ষ ও সমতুল্য কোন বিধানই আজকের পৃথিবীতে নেই।

৬. সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা

ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম বৈপ্লবিক দিক, সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা। ইসলাম-পূর্ব যুগে সাধারণভাবে সম্পত্তিতে নারীদের কোন অধিকার ছিল না। ক্ষেত্র বিশেষে অনুকম্পাবশতঃ কাউকে কিছু দিলেও তা ছিল নিতান্তই দয়ার দান, অধিকার হিসেবে নয়। তার পরিমাণও যৎসামান্য, কিন্তু কখনোই কন্যারা পিতার বা স্ত্রীরা স্বামীর সম্পত্তির মালিকানা বা উত্তরাধিকারত্ব লাভ করতো না। বরং নারীরা নিজেরাই ছিল পণ্য সামগ্রীর মতো। এই অবস্থার অবসান ও প্রতিবিধানের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল-কুরআনে সূরা আন-নিসার দুইটি দীর্ঘ আয়াতে সম্পত্তির ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারিণী হিসেবে নারীদের অংশ নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেই প্রথম পৃথিবীর মাতা, ভগ্নি, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ও অংশ স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এখনও পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদভিত্তিক রাষ্ট্রে নারীর এই গণতান্ত্রিক ও স্বাভাবিক অধিকারের সার্বজনীন স্বীকৃতি পরিলক্ষিত হয় না। এ থেকেই ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব, আধুনিকত্ব ও বিপ্লবী স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

ইসলামে নারীকে দুই দিক দিয়ে সম্পত্তিতে অংশীদারিত্ব প্রদান করা

হয়েছে। প্রথমতঃ পিতার দিক হতে। দ্বিতীয়তঃ স্বামীর দিক হতে। পিতার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার বর্তাবে। একইভাবে স্বামীর মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। উপরন্তু স্ত্রী তার দেন-মোহরও পাবে। এভাবেই পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে যুগপৎ উত্তরাধিকারত্ব প্রদান করা হয়েছে নারীকে। যদি কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয় তাহলে ইদ্দৎ পালনের সময়ে ভরণ-পোষণের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে স্বামীকেই। তাছাড়া স্বামী মারা গেলে তখনও তারই বাড়ীতে ন্যূনতম পক্ষে এক বছর স্ত্রীর বসবাসের হক রয়েছে, যদি তার মধ্যে স্ত্রী অন্যত্র পুনরায় বিবাহ না করে। ঐ সময়ের খরচও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতেই বহন করা হবে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ইসলামের এই কালজয়ী, যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ যখন গৃহীত হয়েছিল নারী তখন বিবেচিত হতো সাধারণ পণ্যের মতো। বাজারে যেমন পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হয় সেভাবে তাদেরকেও ক্রয়-বিক্রয় করা হতো। কন্যা সন্তান জন্মানো ছিল অপরাধের শামিল। তাদেরকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা হতো। ইসলাম পূর্ববর্তী কোন সমাজেই নারীর সামাজিক অধিকারের ও সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারের স্বীকৃতি ছিল না। কি স্বামীর সম্পত্তি, কি পিতার সম্পত্তি কোন কিছুতেই তাদের স্বাভাবিক ওয়ারিশত্ব বা উত্তরাধিকারত্বের আইন ছিল না। ইসলামী বিধানের অনুকরণে বহু শতাব্দী পরে ইউরোপে নারীকে কিছুটা অধিকার ও সম্মানের পাত্রী হিসেবে মর্যাদা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোনক্রমেই তা ইসলামে প্রদত্ত সম্মান, অধিকার ও প্রতিষ্ঠার সমতুল্য নয়। মানুষের রচিত বিধানে তা সম্ভবও নয়।

৭. বৈধ পন্থায় উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনের নির্দেশ

ইসলামী বিধানে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কাজকে হালাল বা বৈধ এবং কিছু কাজকে হারাম বা অবৈধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের ক্ষেত্রেও এই বিধান প্রযোজ্য। ইসলামী বিধান অনুযায়ী যে কেউ স্বাধীন ও অবাধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে পারে। যে সমস্ত

বিষয় শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল বা বৈধ সে সবের উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের মৌলিক নীতিমালার অন্যতম মূখ্য নীতি হচ্ছে 'আমর বিল মারূফ' বা সৎ কাজের আদেশ এবং 'নেহী আনিল মুনকার' বা অসৎ কাজে নিষেধ করা। ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এই বিধান অবশ্য পালনীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

অর্থ : তারা (মুমিন মুসলমান) এরূপ ভাল লোক যে, যদি আমি (আল্লাহ) তাদেরকে দুনিয়াতে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজ করতে নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হতে লোকদের ফিরিয়ে রাখে। (সূরা আল-হজ্জ : ৪১ আয়াত।)

আল-কুরআনেরই অন্যত্র বলা হয়েছে–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ـ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ

অর্থ : মুমিন নর-নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের উপদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে। (সূরা তাওবা : ৭১ আয়াত।)

হালাল বা বৈধ পদ্ধতিতে যে কেউ অর্থ উপার্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। এজন্যে সে নিজের পছন্দসই যে কোন উপায় ও পথ অবলম্বন করতে পারে। এর সাহায্যে যে কোন পরিমাণ অর্থও রোজগার করতে পারে। কিন্তু হারাম পদ্ধতিতে একটি পয়সাও উপার্জন করার অধিকার ইসলাম স্বীকার করেনি বা ইসলামী রাষ্ট্রে সে সুযোগ থাকে না, কাউকে দেয়া হয় না। বস্তুতপক্ষে হালাল অর্জন ও হারাম বর্জন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার Corner stone বা ভিত্তি প্রস্তর। ইসলাম-পূর্ব যুগে তো দূরের কথা বর্তমান সভ্য যুগেও অন্যান্য মতাদর্শ বা ইজমভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উপার্জন, ভোগ ও

বন্টনের ক্ষেত্রে এই বৈধতা বা হালাল-হারামের পার্থক্য নেই। সেখানে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থাৎ লাইসেন্স করে নিলে সব ধরনের উপার্জনের পন্থাই বৈধ। সরকারকে ধার্যকৃত কর, ফি, বা শুল্ক দিলেই এসব উৎস হতে যে কোন পরিমাণ আয়েই তার বৈধ মালিকানা স্বীকৃত হবে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদন, ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে কোন শেষসীমা বা বৈধ-অবৈধতার প্রশ্ন নেই। এমন কি যেসব পন্থায় উৎপাদন সমাজের জন্যে ক্ষতিকর ও যেসব পন্থায় ভোগ সমাজের জন্যে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সেসবও সমাজ ও অর্থনীতিতে অপ্রতিহতভাবে চলতে পারে। শর্ত শুধু লাইসেন্স করে নেওয়া বা নির্দিষ্ট হারে কর বা শুল্ক নিয়মিত পরিশোধ করে দেয়া। সমাজতন্ত্রের অবস্থাও প্রায় একই রকম। তফাৎ এই যে, সেখানে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও অতি মাত্রায় সীমিত। তবে ভোগের ক্ষেত্রে পার্টির ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের জন্যে এ নিয়ন্ত্রণ সব সময়ই শিথিলযোগ্য। ইসলামে এই দুই ধরনের নীতির কোনটিই সমর্থন করা হয়নি। যা বৈধ ও যে পরিমাণ বৈধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে যা নিষিদ্ধ তা সকলের জন্যেই সমভাবে নিষিদ্ধ।

বৈধ উপায়ে যে সম্পদ ও অর্থ অর্জিত হয়, তা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ইসলাম বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে একেবারে স্বাধীন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও বাধা-বন্ধনহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়নি। হালালভাবে প্রাপ্ত বা উপার্জিত সম্পদ মাত্র চার উপায়েই ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। যথা–

ক. বৈধ বা হালাল পন্থায় ভোগ;

খ. লাভজনক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ;

গ. দান-সদ্‌কাহ্ এবং

ঘ. আল্লাহর পথে ব্যয়।

ক. বৈধ বা হালাল পন্থায় ভোগ : ইসলামী সমাজে মানুষ তাদের বৈধ আয়ও এমনভাবে ব্যয় করতে পারবে না যা তাদের নিজেদের চরিত্রের ও

সমাজের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। এ জন্যে মদ্যপান, ব্যভিচার, জুয়া, নাচ-গান, রং-তামাসা, বাজী-লটারী, নৈতিকতা বিরোধী বিলাস-ব্যসন, সোনা-রূপার তৈজসপত্র ব্যবহার সবই নিষিদ্ধ। এসব নিষিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করে নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্যে স্বাভাবিক ব্যয় নির্বাহ ও মধ্যম ধরনের জীবন যাপন করার জন্যেই ইসলাম নির্দেশ দেয়।

খ. লাভজনক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ : নিজের প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত ও সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত ধনসম্পদকে ব্যবসায়, কৃষি, শিল্প কিংবা এই ধরনের অন্যান্য অর্থকরী কাজে বিনিয়োগ করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে। নিজের পক্ষে এককভাবে সম্ভব না হলে অন্যের সাথে লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের বা মুদারিবাতের ভিত্তিতেও এই জাতীয় কাজে অর্থ বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। এই সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও অবশ্যই ইসলামী শরীয়তসম্মত হতে হবে।

গ. দান ও সদ্কাহ : নিজস্ব ও পারিবারিক খরচ মিটিয়ে ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগের পরেও যদি উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তবে তা থেকে দান ও সদকাহ করাই উত্তম। এ প্রসঙ্গে আল্-কুরআনে যে নির্দেশ রয়েছে তা হচ্ছে-

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ - قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ-

অর্থ : তারা জিজ্ঞেস করে যে, তারা কি খরচ করবে ? বলে দিন যে, তোমরা তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সমাজ ও জাতির জন্যে ব্যয় করো। (সূরা আল্-বাকারাহ : আয়াত-২১৫)

রাসূলে কারীম (সা) এই সূত্রে বলেছেন-

"হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার উদ্বৃত্ত সম্পদ আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যয় কর তবে তা তোমার জন্যে উত্তম। আর যদি তা থেকে বিরত থাক, তবে তাতে তোমার অকল্যাণ।" (তিরমিযী)

উপরে উদ্ধৃত আল্-কুরআনের আয়াত ও হাদীস হতে একথাই প্রমাণ হয় যে, উদ্বৃত্ত অর্থ আল্লাহর রাস্তায় দান করাই সবচেয়ে উত্তম। মুসলমান হিসেবে এভাবেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। আর প্রত্যেক মুসলমানের একান্তভাবে তাই কাম্য।

ঘ. আল্লাহর পথে ব্যয় : মুসলমান থাকার শর্ত পূরণ করার জন্যেই আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা অত্যাবশ্যক। সূরা বাকারার একেবারে শুরুতেই আল্লাহ মুত্তাকীনদের যে পরিচয় প্রদান করেছেন সেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন–

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ لا الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ .

অর্থ : এটি সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্যে এতে রয়েছে পথ নির্দেশ। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। (সূরা আল-বাকারা : আয়াত-২-৩)

বস্তুতঃপক্ষে আল্লাহর রাস্তায় তাঁরই দেওয়া রিযিক হতে ব্যয়ের কোন বিকল্প নেই। ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে, একে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাইলে যে ব্যয় করতে হবে তার জন্যে সকল মুসলমানকেই এগিয়ে আসতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার যে নানামুখী কর্মসূচী রয়েছে সেসবের জন্যে যেমন মুক্ত হস্তে ব্যয় করা অপরিহার্য তেমনি ইসলামের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে অপপ্রচার ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে এর স্রোতে ভেসে যাবে মুসলিম নামসর্বস্ব তরুণ-তরুণীরা। ইসলামবিরোধী শক্তিসমূহ যে বিপুল আয়োজন, সামর্থ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে ইসলামকে তার ভিতর ও বাহির থেকে ধ্বংসের পাঁয়তারা করে চলেছে তাঁর প্রতিবিধানের জন্যে যেমন চাই বলিষ্ঠ ও পরিকল্পিত কর্মসূচী তেমনি চাই সেসবের বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান। এই অর্থ দিবে

মুত্তাকীনরাই। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুত্তাকীন হওয়ার শর্তের মধ্যেই তাঁরই দেয়া রিযিক থেকে ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। একদিন মুসলমানরা সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলো বলে ইসলামের পতাকা উডডীন হয়েছিলো বিশ্বের দিকে দিকে। কিন্তু যখনই মুসলমান তা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গেল, বিত্তবৈভব সঞ্চয় করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুললো তখনই দুনিয়ার বাদশাহী তার হাত ছাড়া হয়ে গেলো।

৮. করযে হাসানা ও মুদারিবাতের প্রবর্তন

ইসলাম প্রবর্তিত বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে করযে হাসানা ও মুদারিবাত অন্যতম। বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতার দিক থেকে এ ছিল সমকালীন অর্থনীতিতে এক বলিষ্ঠ ও ভিন্নতর পদক্ষেপ। সুদমুক্ত অর্থনীতি বাস্তবায়নের জন্যে করযে হাসানা ও মুদারিবাত ছিল অন্যতম কার্যকর হাতিয়ার। প্রকৃতপক্ষে রাসূলে কারীম (সা)-এর জীবন হতে শুরু করে আব্বাসীয় খিলাফতের পরেও সুদীর্ঘ তিনশত বছরেরও বেশী এ দুটি বিষয় ইসলামী সমাজে যথাযথ চালু ছিল বলেই সুদ ইসলামী অর্থনীতির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারেনি। এখনও সুষ্ঠুভাবে এ দুয়ের প্রবর্তন করতে পারলে সুদ সমাজ হতে বিদায় নিতে বাধ্য।

হযরত উমর ফারুক (রা)-এর সময়েই বায়তুল মাল হতে করযে হাসানা দেবার রীতি ব্যাপকভাবে চালু হয়। ব্যক্তিগত প্রয়োজন ছাড়াও ব্যবসায়িক বিনিয়োগ ও কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্যেও বায়তুল মাল হতে করযে হাসানা নেবার ব্যবস্থা ছিল। এক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বা পক্ষপাতিত্ব করা হতো না। জনসাধারণ ছাড়াও সরকারী কর্মচারীরাও নিজেদের চাকুরীর জামানতে বায়তুল মাল হতে ঋণ নিতে পারতো। প্রসঙ্গতঃ একথা মনে রাখা দরকার, বায়তুল মাল ছাড়াও ইসলামী সমাজে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে করযে হাসানা সব সময়েই নিতে পারবে। বরং এ সাহায্য করার জন্যে মন-মানসিকতার দিক থেকে সম্পদশালী ব্যক্তিগণ সব সময়েই প্রস্তুত থাকবেন।

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً- وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ- وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ-

অর্থ : কে সেই লোক যে আল্লাহ তায়ালাকে করজে হাসানা (উত্তম ঋণ) দিতে প্রস্তুত আছে? কেউ যদি তা দেয়, তবে আল্লাহ তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত-২৪৫)

এ ছাড়াও সূরা আল-মায়েদা (১২ আয়াত), সূরা আল-হাদীদ (১১ ও ১৮ আয়াত), সূরা আল-মুজাম্মিল (২০ আয়াত) প্রভৃতিতে আল্লাহ এই একই বিষয়ে বারংবার জোর দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ঋণ দেয়ার অর্থ হচ্ছে অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্যপীড়িত লোকদের বিনাসুদে ঋণ দেয়া। এই ঋণ পরিশোধের জন্যে সঙ্গত সময় দেয়াও কর্তব্য।

মুদারিবাত বা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায় প্রচলন ও ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থার এক অনন্য অবদান। সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে, যাদের নিকট প্রচুর অর্থ রয়েছে। কিন্তু তা কাজে লাগাবার মতো শ্রমশক্তি বা ব্যবসায়িক বুদ্ধি তাদের হয়তো নেই। হয়তো বা শরিয়তী কারণে তাদের এ জাতীয় কাজ করার সুযোগ বা সাধ্য নেই। অনুরূপভাবে সমাজে এমন বহু লোক রয়েছে যাদের প্রয়োজনীয় শ্রমশক্তি ও ব্যবসায়িক বুদ্ধির অভাব নেই। অভাব শুধু প্রয়োজনীয় অর্থের। যদি এই দুই ধরনের লোকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় তাহলে সমাজে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও অর্থাগমের নতুন পথ উন্মুক্ত হবে এবং এর ফলে ঐ দুই শ্রেণীর লোকেরই শুধু উপকার হবে তাই নয়, সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হবে।

মুদারিবাতের গুরুত্ব এই জন্যে যে, এভাবে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায় বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান হতে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা পূর্ব নির্ধারিত অংশ বা হার অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে ভাগ হবে। কিন্তু মুনাফা না হলে উভয়ে কিছুই

পাবে না। যদি কোন কারণে লোকসান হয় তাহলে তা বহন করবে শুধুমাত্র অর্থ বা মূলধন বিনিয়োগকারী। উদ্যোক্তা বা শ্রমদানকারী ব্যক্তি তা বহন করবে না। তাছাড়া, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যদি ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা যায়, কল-কারখানা গড়ে ওঠে তাহলে মূলধনের সংকট হ্রাস পাবে। সুদনির্ভর ব্যাংক এবং পুঁজিপতির অত্যাচার হতেও রেহাই পাওয়া যাবে। কেননা ব্যবসায় ও কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্যেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন হয়। ঋণের দরকারও হয় এই একই কারণে।[১] তাই এই উপায়ে যদি অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হয় তবেই সুদভিত্তিক ঋণ কেউ নিতে চাইবে না। তার প্রয়োজনও হবে না।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে লগ্নী কারবারে বা ঋণ-ভিত্তিক ব্যবসায়ে যত শোষণ ও যুলুমের অবকাশ থাকে ইসলামী অর্থনীতি তা দূর করার মানসেই মুদারিবাতের প্রবর্তন করেছে। উপরন্তু বহু ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে তাদের সম্মিলিত ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সাহায্যে বিরাট আকারের পুঁজি গড়ে তুলতে এবং শরীয়তসম্মত যে কোন ব্যবসায় বা উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করতে পারে। এতে বিরাট আকারের ও ভারী ধরনের কল-কারখানা গড়ে উঠতে পারে। মজবুত হতে পারে অর্থনীতির সম্প্রসারণ ও দেশের আর্থিক বুনিয়াদ। এক্ষেত্রে মুনাফা বন্টন করার জন্যে অংশীদারদের মধ্যে পূর্বেই সরাসরি চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে। পুঁজির অংশ অনুযায়ীই মুনাফা বন্টিত হবে, পূর্ব নির্ধারিত কোন হারে মুনাফা বণ্টনের শর্ত থাকবে না। এভাবেই পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করেছে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

৯. ন্যায়সঙ্গত রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিধান

ইসলামী অর্থনীতির মৌল উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। অন্যসব অর্থনৈতিক বিবেচনাকে সামাজিক সুবিচার ও মূলনীতির আলোকেই বিচার-বিশ্লেষণ ও গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক

---

১. সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর বহু মুসলিম দেশে তো বটেই, অনেক অমুসলিম দেশেও ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক, ফাইন্যান্সিং হাউস ও বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই এবং সেসব প্রতিষ্ঠান ঈর্ষণীয় সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

সুবিচার ব্যাহত হতে পারে এমন কোন অর্থনৈতিক নিয়ম বা নীতি কার্যকর করতে বা থাকতে দেয়া কিছুতেই সঙ্গত হতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুবিচার ও সৎ কাজের যে আদেশ দিয়েছেন তা প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্যে অবশ্য পালনীয়। এ থেকে কোন মুসলিম বা রাষ্ট্রীয় সরকার অব্যাহতি পেতে পারে না। একইভাবে অসৎকাজ হতে দূরে থাকার নিষেধাজ্ঞা পালনও এই উভয়ের জন্যে অবশ্য কর্তব্য।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে অবশ্যই 'মারূফ' বা সুনীতির প্রতিষ্ঠা এবং 'মুনকার' বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করতে হবে। অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে সমস্ত উপায়ে সুবিচারমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা। আর দুর্নীতির প্রতিরোধের অর্থ হচ্ছে সব ধরনের অর্থনৈতিক যুলুম ও শোষণের পথ বন্ধ করা। সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও যুলুমের অবসানের জন্যে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব আইন রচনা করতে পারে। এই জন্যে প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা আল্লাহ আল-কুরআনেই প্রদান করেছেন। ইসলামী সরকার আইন প্রয়োগ করে অবৈধ উপার্জনের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিতে পারে, সব ধরনের অনাচারের উচ্ছেদ করতে পারে। এই উপায়েই সুদ, ঘুষ, মুনাফাখোরী, মজুতদারী, চোরাচালান, কালোবাজারী, পরদ্রব্য আত্মসাৎ, সব ধরনের জুয়া, হারাম সামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচলিত সব ধরনের অসাধুতা ইত্যাদি সমস্ত প্রকারের অন্যায় অর্থনৈতিক কাজ সমূলে উৎপাটন করতে পারে এবং আইনের সাহায্যেই সরকার যাকাত আদায় ও বিলি–বন্টন, বায়তুল মালের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, উত্তরাধিকার বা মীরাসী আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন, ইসলামী শ্রমনীতির রূপদান করযে হাসানার প্রবর্তন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক কার্যক্রমও গ্রহণ করতে পারে।

জনসাধারণের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও তার ফলাফল সম্বন্ধে সরকার উদাসীন থাকবে এটা কাম্যও নয়, বাস্তবসম্মত ব্যাপারও নয়। এক সময়ে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের কয়েকটি দেশে 'লেইসেজ-ফেয়ার' Laissez faire তত্ত্ব চালু হয়েছিল। এই তত্ত্বের মোদ্দাকথা হচ্ছে, জনগণ ও রাষ্ট্র নিজের নিজের কাজ করে যাবে। কেউ কারো অধিকার ও কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অবিবেচনাপ্রসূত ও স্বার্থান্ধ তৎপরতার ফলে

জনস্বার্থের ক্ষতি হলেও রাষ্ট্র তার বিরুদ্ধে সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না, এ যেমন এক অস্বাভাবিক পদ্ধতি, তেমনি রাষ্ট্র প্রতিটি কাজে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করবে স্বেচ্ছাচারের ভিত্তিতে, সেও আর এক অস্বাভাবিক অবস্থা। ইসলাম এ দুয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে মধ্যম পন্থাই উত্তম পন্থা। রাষ্ট্র অবশ্যই জনগণের তথা দেশের অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় ভাল বিষয়গুলি বাস্তবায়নের জন্যে চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি উচ্ছেদও করবে। এটা রাষ্ট্রের ন্যায়সঙ্গত এখতিয়ার।

আলোচ্য প্রসঙ্গে কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কারণ ও ফলাফল পর্যালোচনা করা দরকার। সেগুলি হচ্ছে-

ক. সম্পদ উপার্জন

খ. ভূমি ও কৃষি

গ. শিল্প ও শ্রমিক

ঘ. ব্যবসায় এবং

ঙ. দ্রব্যমূল্য ও বাজার।

ক. সম্পদ উপার্জন : ইসলামী রাষ্ট্র অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখবে ব্যক্তির উপার্জনের প্রতি। উপার্জনের পথ ও পদ্ধতি হালাল বা বৈধ হতে হবে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত সমস্ত সম্পদ ইসলামী সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। কেননা সব অবৈধ পন্থাই হচ্ছে হারাম বা মুনকার এবং মুনকারের নির্মূল করা ইসলামী সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। যদি অন্যের জমি, সম্পত্তি বা অর্থ কেউ জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে আত্মসাৎ করে থাকে তবে রাষ্ট্র তা উদ্ধার করে মূল বা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেবে। তা সম্ভব না হলে ঐ ধন-সম্পদ বায়তুল মালে জমা হবে। এমনকি কোন শাসনকর্তা বা সরকারী কর্মচারী পদের সুযোগ নিয়ে বিত্ত-সম্পত্তি করলে তারও অংশবিশেষ সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। যদি এ কাজ না করা হয়, তবে সমাজে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার অব্যাহত থাকবে। পরিণামে তা রাষ্ট্রের ও সমাজের অকল্যাণ ও মারাত্মক দুর্গতি ডেকে আনবে।

খ. ভূমি ও কৃষি : ইসলামী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে মীরাস বা উত্তরাধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করা। বিশেষতঃ এতিম ও স্ত্রীলোক এই বিধানের সুফল পাচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। আমাদের সমাজে ন্যায্য প্রাপ্য জমি হতে বোনেরা প্রায়ই বঞ্চিত হয়। সৎভাই-বোনেরা বিতাড়িত হয়। নানার সম্পত্তির অংশ আদায় করতে দৌহিত্রদের বিচারালয়ের দ্বারস্থ হতে হয়। এর কারণ মীরাসী আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের অভাব। এ ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে। পক্ষপাতহীন শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই এই দুর্নীতি দমন সম্ভব।

অসিয়ত ও ওয়াকফকৃত জমি যেন সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে রাষ্ট্রকে। জমি যেন অনাবাদী ও পতিত পড়ে না থাকে সে ব্যবস্থা করা সরকারেরই দায়িত্ব। উপরন্তু জমির উৎপাদন ক্ষমতা, পরিমাণ ও গুণাগুণের ভিত্তিতে খাজনা ও খারাজ জনগণের জন্যে দুর্বিসহ ভারের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা তাও মাঝে মাঝে যাচাই করে দেখা সরকারের কর্তব্য। কৃষির জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে কৃষককে সাহায্য করাও দরকার। কৃষি পণ্যের বাজার, মূল্য ও সরবরাহের উপরও সরকারকে অবশ্যই নজর দিতে হবে ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে। তা না হলে একদিকে বাজারে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের সরবরাহ যেমন অনিশ্চিত হবে, অন্যদিকে কৃষকও তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায়সঙ্গত দাম হতে বঞ্চিত হবে। তাছাড়া মূল্য বেড়ে গিয়ে জনগণেরও অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। অর্থনীতির এই মৌলিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর তাই সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখা সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব।

গ. শিল্প ও শ্রমিক : যে সমস্ত জিনিসের বা পণ্যের ভোগ ও ব্যবহার ইসলামে নিষিদ্ধ। সেসব উৎপাদনের জন্যে শিল্প-কারখানা যেন দেশে গড়ে না ওঠে তা দেখা সরকারের দায়িত্ব। শিল্প-কারখানা যেন ইসলামী নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় সে জন্যে প্রয়োজনীয় আইন ও আর্থিক কাঠামো দেশের অভ্যন্তরে গড়ে তুলতে হবে। ব্যবসায়ী ও শিল্পমালিকরা এসব আইন যদি মেনে না চলে তবে সরকার তাদের সম্পত্তি সাময়িকভাবে নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারবে। এ ব্যবস্থাকে ইসলামী পরিভাষায় "হিজর"

বলে। হিজরের অর্থ নিরস্ত করা। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সরকার এ কাজ করতে পারে। ঐ সময়ে অবশ্য সরকার তাদের ভরণ-পোষণের অর্থ দিতে বাধ্য থাকবে। প্রচলিত 'ফ্রিজ' করার নীতি থেকে এ নীতি শুধু ভিন্নই নয়, অনেক উন্নতও। হিজরের ব্যবস্থা ব্যবসায়ী ও শিল্পমালিকদের সতর্ক থাকতে বাধ্য করবে। ফলশ্রুতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে নৈতিক পরিবেশ বজায় থাকবে।

ইসলামী সরকারের একটি প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার পাওয়ার ব্যবস্থা করা। তাদের উপর যাতে যুলুম না হতে পারে তার যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শ্রমিকদের মজুরী যেন তাদের জীবন-যাপনের জন্যে উপযুক্ত হয় তা নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব। ইসলামের মানবিক শ্রমনীতি আলোচনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত মূলনীতির কথা বলা হয়েছে তার আলোকে সরকার একটা নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করে দেবে। ব্যবসায়ী ও শিল্পমালিকরা এই মজুরী দিতে বাধ্য থাকবে। বাস্তবতার আলোকেই সরকার শ্রমিকদের অন্যান্য সুবিধা দানের ব্যবস্থা সম্বলিত আইন প্রণয়ন করবে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ, বাসস্থান, চিকিৎসা, বোনাস ইত্যাদির সুবিধাও এই আইনে থাকবে। এসব আইনের উদ্দেশ্য হবে শ্রমিকদের সত্যিকার স্বার্থ রক্ষা করা। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর অস্বাভাবিক বোঝা চাপিয়ে দিয়ে অর্থনৈতিক উদ্যোগ নষ্ট করা কিছুতেই সমীচীন হবে না।

ঘ. ব্যবসায় : ব্যবসায়ের সব অবৈধ ও অন্যায় পথ এবং প্রতারণামূলক কাজ নিষিদ্ধ করাই শুধু ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্ব নয়, বরং তার যথাযথ বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তাও দেখা কর্তব্য। ইহ্তিকার অর্থাৎ অধিক লাভের আশায় পণ্য মজুদ রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। ধোঁকাবাজি করা অন্যায়। ভেজাল দেয়া যে কোন বিচারেই মারাত্মক অপরাধ। ওজনে কারচুপিও তাই। এমনি বহু অপরাধ ও অন্যায়ের সুযোগ রয়েছে ব্যবসায়ে। এ সমস্তই প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। না হলে এসবের রন্ধ্রপথে ব্যবসায়ীরা লুটে নেবে জনসাধারণকে। উপরন্তু সাধারণ লোক ক্রমাগত ঠকতে থাকবে। এর প্রতিবিধানের জন্যে হযরত উমর ফারুক

(রা)-এর আমলেই "হিস্‌বাহ" নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানই কায়েম হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর এই শেষ ধাপে এসে বিভিন্ন দেশের সরকার যেসব অপরাধ নিবারণের জন্যে আইন প্রণয়ন করছে সেসব অপরাধ দমন ও দূর করার জন্যে বহু পূর্বেই ইসলাম বিধান রচনা করেছে। সে যুগে এ সবই ছিল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে ভিন্নতর এবং বিপ্লবাত্মক। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় সমাজকে তথা মানব চরিত্রকে কত গভীরভাবে রাসূলে কারীম (সা) এবং খুলাফায়ে রাশিদীন (রা) পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দেয়া বিধানসমূহ কত পূর্ণাংগ ও বাস্তবসম্মত।

ঙ. দ্রব্যমূল্য ও বাজার : ইসলামী রাষ্ট্রে সরকার প্রয়োজনবোধে দ্রব্যমূল্যও নিয়ন্ত্রণ করবে। স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামের নীতি নয়। কিন্তু ব্যবসায়ীরা যদি অন্যায় ও অসংগতভাবে পণ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি করতে থাকে তাহলে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জিনিসপত্রের দাম নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন-

"যদি স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্যে মূল্য ন্যায়সঙ্গত পর্যায়ে নির্ধারিত না হয় তবে জনগণের জন্য ইসলামের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে; কমও নয়, বেশীও নয়।" (আল হিসবাহ্‌ ফিল ইসলাম)

ইবনে নখীম হানিফী বলেন-

"বিশেষ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে এবং এ অধিকারের শরিয়তী বুনিয়াদ হচ্ছে 'জনগণের অসুবিধা দূর করা অপরিহার্য।" (আল-হিসবাহ্‌ ওয়া নাজায়ের)

বাজার ব্যবস্থার উপরও সার্বক্ষণিক নজর রাখা সরকারের দায়িত্ব ও অবশ্য কর্তব্য। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক (রা) নিজেই এ কাজ করতেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজার যেন স্বাভাবিক নিয়মে চলে। ব্যবসায়ীদের অসাধুতা ও শঠতা, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, ওজনে কারচুপি,

ভেজাল, নকল প্রভৃতি বাজারে অনুপ্রবেশের সুযোগ না পায়। দেশে পণ্যসামগ্রীর অভ্যন্তরীণ চলাচলের উপর বিধি-নিষেধও সম্ভবপর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তুলে নিতে হবে। কারণ, খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর অবাধ চলাচলের উপর বাধা-নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলেই কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি হয় ও দুর্নীতির পথ প্রশস্ত হয়। তাই বাজার ব্যবস্থা সহজ রাখার উদ্দেশ্যে ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক করার জন্যে সরকারকে সুষ্ঠু ও দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ইসলামী অর্থনীতির দাবীই তাই। যে দেশে ও সমাজে যখনই এর ব্যত্যয় ঘটেছে তখনই সে দেশের সমাজে ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেমে এসেছে হতাশা, নৈরাজ্য ও বিপর্যয়।

১০. সমাজকল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবর্তন

যে কোন উত্তম অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিচায়ক হচ্ছে তার সমাজকল্যাণ ও জনগণের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যে গৃহীত ব্যবস্থা। প্রচলিত সমস্ত অর্থনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক মতাদর্শসমূহে এ জন্যেই সমাজকল্যাণের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সে সবের কোনটিই এদিক দিয়ে ইসলামী অর্থনীতির সমকক্ষ নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামেই জনকল্যাণের জন্যে সর্বপ্রথম সর্বাত্মক জোর ও সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এ ব্যাপারে শুধু আল-কুরআন ও হাদীস শরীফে যে নির্দেশ রয়েছে তার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারলে গোটা সমাজ ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হওয়া সম্ভব। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনগণের জন্যে যতটুকু না করলেই নয়, বা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আপন আপন মর্জি-মাফিক যতটুকু করতে ইচ্ছুক, ততটুকুই মাত্র জনসাধারণ পেতে পারে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে একদলীয় সরকারের নিজস্ব নীতি ও প্রয়োজন অনুসারে জনকল্যাণমূলক নীতি গৃহীত হয়ে থাকে। এর কোনটিই পূর্ণাংগ ও সুষ্ঠু হতে পারে না।

জনকল্যাণের জন্যে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ছাড়াও ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ব্যক্তিকেও নিজস্ব সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী এগিয়ে আসতে হবে। ব্যক্তির ধন-সম্পত্তিতে অন্যেরও হক বা অধিকার রয়েছে। ইসলামেই

সর্বপ্রথম ব্যক্তির সম্পদে সমাজের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ. (الذاريات : ١٩)

অর্থ : তাদের (বিত্তশালীদের) ধন-সম্পদে প্রয়োজনীয় প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। (সূরা আল জারিয়াহ, আয়াত-১৯)

وَاٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَاتُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا. (بنى اسرائيل : ٢٦)

অর্থ : তুমি আত্মীয়-স্বজন ও গরীব এবং পথের কাঙ্গালদেরকে তোমার নিকট হতে তাদের পাওনা দিয়ে দাও। (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত-২৬)

রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন– "তোমাদের ধন সম্পদে (যাকাত ছাড়াও) সমাজের অধিকার রয়েছে। (তিরমিযী)

উপরের আয়াত দু'টি ও হাদীসে শরীফের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোন ব্যক্তির উপার্জিত অর্থে তার নিজের ছাড়াও তার আত্মীয়-স্বজন ও সমাজের অন্যান্য অভাবগ্রস্তদের হক বা অধিকার রয়েছে। সমাজের কোন ব্যক্তি যদি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী হয় এবং তার আত্মীয়দের মধ্যে কেউ প্রয়োজনের চেয়ে কম উপার্জন করে তাহলে সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ আত্মীয়কে সাহায্য করা তার সামাজিক দায়িত্ব। আত্মীয়দের মধ্যে কেউ এমন না থাকলে প্রতিবেশী বা পরিচিতদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত বা নিজস্ব প্রয়োজন পূরণে অক্ষম এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করা ঐ ব্যক্তির পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির উপরই এ দায়িত্ব রয়েছে। এমন ব্যাপকভাবে প্রতিটি ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নির্দেশ পৃথিবীর আর কোন ধর্মে বা মতাদর্শে ইসলামের পূর্বে দেয়া হয়নি, পরেও না। বস্তুত এই নির্দেশের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব-অনুভূতির প্রেরণা রয়েছে।

আল-কুরআনে ব্যক্তির হকের মধ্যে সর্বপ্রথম মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনদের হকের উল্লেখ করা হয়েছে। তার পরেই প্রতিবেশীদের হক। এই

দুই দায়িত্ব পালনের পর প্রত্যেক সাহায্য প্রার্থী বা সাহায্যের মুখাপেক্ষীকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করতে হবে। উপরন্তু ইসলাম মুসলমানদের আল্লাহর পথে দান করার সাধারণ নির্দেশ দিয়ে তাদের অর্থ সম্পদে সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁকে প্রতিটি সৎকাজে এবং সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যে অর্থ ব্যয় করতে হবে। এভাবেই কোন প্রকার ট্যাক্স বা কর আরোপ ও বলপ্রয়োগ ছাড়াই হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় প্রতিটি মুসলমান সমাজকল্যাণে সহায়ক শক্তি হিসেবে নিজের বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে।

জনকল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ও সমাজের সাধারণ মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্যে ইসলামে দু'টি বলিষ্ঠ প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে– যাকাত ও বায়তুলমাল। যাকাত কারা দেবে, কিভাবে তা আদায় হবে এবং কারা যাকাতের হকদার, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বায়তুল মাল সৃষ্টির উদ্দেশ্য, এর অর্থাগমের উৎস ও ব্যয়ের খাত প্রভৃতি সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। ইসলামী সমাজে বায়তুল মাল ও যাকাত একযোগে যে বিপুল জনকল্যাণমূলক কাজ করতে পারে এবং দুঃস্থ, দারিদ্র্যপীড়িত, অক্ষম, বৃদ্ধ, পঙ্গু, বিধবা, এতিম ও শিশুদের যে আর্থিক নিরাপত্তা দিতে পারে তা আর কোনভাবেই সম্ভব নয়। ইসলামপূর্ব যুগের কোন সমাজে তা ছিল না, এখনও নেই। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ভয় দেখিয়ে, যুলুম করে, ক্ষেত্রবিশেষে জোর-জরবদস্তিমূলক কর আদায় করে কোন সমস্যার সাময়িক উপশম করতে পারে বটে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ সাধন হয় না। স্বেচ্ছায় মানুষ যখন কোন কাজে সাড়া দেয় এবং অংশগ্রহণ করে তখন যে দুর্বার শক্তির সৃষ্টি হয় তার মুখে কোন বাধাই যেমন বাধা নয়। তেমনি কোন কাজই কঠিন ও অসম্ভব নয়।

যাকাত ও বায়তুল মাল ছাড়াও ইসলামে মীরাসী আইনের প্রয়োগ, মানবিক শ্রমনীতির প্রবর্তন, সম্পত্তিতে নারীর অধিকারের প্রতিষ্ঠা, করযে হাসানার বিধান এবং উপার্জন ভোগ বন্টন প্রভৃতি ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য নির্দেশ একদিকে বহু সামাজিক অনাচারের পথ যেমন চিরতরে রুদ্ধ করে

দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ও জনসাধারণের দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ ও উন্নয়নের পথ সুগম করেছে। বস্তুতঃ উপরোক্ত বিষয়গুলির সামষ্টিক ফলই হচ্ছে একটি সুখী, অভাবমুক্ত ও সমৃদ্ধশালী সমাজ। আইয়ামে জাহেলিয়াত ও তার পূর্ববর্তী সমাজ ব্যবস্থাসমূহ হতে ক্রমে ক্রমে যে পংকিলতা ও অনাচার, অভাব ও অনটন অর্থনীতিতে সংক্রমিত হয়েছিল সেসব দূর করার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন-এর নির্দেশিত পথে রাসূলে কারীম (সা) কাজ করে গেছেন। তাঁর সে পথ অনুসরণ করেছেন মহান খুলাফায়ে রাশিদীন (রা)। ফলে অর্থনীতিতে সূচিত হয়েছিল বিপ্লব। প্রয়োগ ও সাফল্যে সৃষ্টি হয়েছিল উন্নয়নের গতিবেগ। তারই সুদূরপ্রসারী ফল হিসেবে এক সুখী ও সমৃদ্ধশালী, সাহিত্য-শিল্পকলা ও বিজ্ঞানে উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

ইসলামী অর্থনীতির যে দশদফা বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য এ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে সে সবই 'আমর বিল-মারূফ' বা সুনীতি প্রতিষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে 'নেহী আনিল-মুনকার' বা দুর্নীতি উচ্ছেদের আওতাভুক্ত চার দফা বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্যও ইসলামী অর্থনীতির রয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে গোড়ার দিকে শুধু উল্লেখ করা হয়েছে। নীচে পর্যায়ক্রমে সেগুলির তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার প্রয়াস পাওয়া গেল।

১১. সুদ ও সুদ নির্ভর কর্মকাণ্ড উচ্ছেদ

ইসলামী অর্থনীতিতে দুর্নীতির অবসান ও যুলুমতন্ত্রের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যে মোক্ষম আঘাতটি হানা হয়েছে তা হচ্ছে সুদের উচ্ছেদ। সুদ ও সুদভিত্তিক সমস্ত কারবার ও লেনদেন চিরকালের জন্যে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আল্-কুরআনে এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে–

أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ط

অর্থ : আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা আল বাকারাহ : আয়াত-২৭৫)

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় ও অর্থনীতিতে যাবতীয় অসৎ কাজের মধ্যে সুদকে সবচেয়ে পাপের জিনিস বলে গণ্য করা হয়েছে। বস্তুত: সুদের মতো সমাজবিধ্বংসী অর্থনৈতিক হাতিয়ার আর দু'টি নেই। সুদের কুফলগুলির প্রতি একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে কেন সুদ চিরতরে হারাম ঘোষিত হয়েছে।

প্রথমত : সমাজ শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম বা উপায় হচ্ছে সুদ। একদল লোক বিনাশ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঋণগ্রহীতা যে কারণে টাকা ঋণ নেয় সে কাজে তার লাভ হোক বা না হোক তাকে সুদের অর্থ দিতেই হবে। এর ফলে অনেক সময় ঋণগ্রহীতাকে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ বিক্রি করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। সুদ গ্রহীতারা হচ্ছে সমাজের পরগাছা। এরা অন্যের উপার্জনে ও সম্পদে ভাগ বসিয়ে জীবন যাপন করে। উপরন্তু বিনাশ্রমে অর্থলাভের ফলে সমাজের প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এদের কোন অবদানই থাকে না।

দ্বিতীয়ত : সুদের কারণেই সমাজের দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণী আরও ধনী হয়। পরিণামে সামাজিক শ্রেণীগত বৈষম্য বেড়েই চলে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষ সাহায্যের আর কোন দরজা খোলা না পেয়ে, উপায়ন্তর না দেখে ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সেই ঋণ অনুৎপাদী ও উৎপাদনী দু'রকম কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনুৎপাদনী কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহারের ফলে তার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতাই লোপ পায়। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজে করযে হাসানার কোন সুযোগ না থাকায় অনুৎপাদী খাতে ঋণ তো দূরের কথা, উৎপাদনী খাতেও ঋণ বিনা সুদে মেলে না। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তাকে সুদের টাকা শোধ করতে হয়। এর ফলে সে তার শেষ সম্বল যা থাকে তাই বিক্রি করে উত্তমর্ণের ঋণ শুধরে থাকে। এই বাড়তি অর্থ পেয়ে পেয়ে উত্তমর্ণ আরও ধনী হয়। একই সঙ্গে সামাজিক শ্রেণীবিদ্বেষ ও নানা অসামাজিক কার্যকলাপও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উপরন্তু আধুনিক ব্যাংক ও বীমা ব্যবসার কল্যাণে ছোট ছোট সঞ্চয় একত্রীভূত হওয়ার সুযোগে বিরাট পুঁজি গড়ে উঠছে। বীমা ও ব্যাংক ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিরা এই পুঁজি চড়া সুদে ঋণ দিয়ে বিপুল অর্থ উপার্জন

করছে। এটাকেই এখন এদেশে সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ে 'মুনাফা' বলে চালিয়ে দেবার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এর ফলে সরলপ্রাণ ধর্মভীরু মানুষ প্রতারিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তৃতীয়ত : সুদের কারণেই ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষকরা ফসল ফলাবার তাগিদেই নিজেরা খেতে না পেলেও ঋণ করে জমি চাষ করে থাকে। এই ঋণ শুধু যে গ্রামের মহাজনের কাছ থেকেই নেয় তা নয়, সরকারের কৃষি ব্যাংক হতেও নেয়। যথোপযুক্ত বা আশানুরূপ ফসল হওয়া সব সময়ই অনিশ্চিত। তাছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্বিপাক তো রয়েছেই। যদি ফসল আশানুরূপ না হয় বা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে ফসল খুবই কম হয় বা মোটেই না হয় তবু কিন্তু কৃষককে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সুদসহ ঋণ শোধ করতে হবে। তা না পারলে কি মহাজন, কি ব্যাংক-সকলেই আদালতে নালিশ ঠুকে কৃষকের সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করিয়ে নেবে। নীলামে চড়াবে দেনার দায়ে। এভাবেই বিশ্বের সমস্ত পুঁজিপতি দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীরা ক্রমেই ভূমিহীন চাষী হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

চতুর্থত : সুদের পরোক্ষ ফল হিসেবে একচেটিয়া কারবারের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় বড় ব্যবসায়ীরা যে শর্তে ও যে সময়ের জন্যে ঋণ পেতে পারে, ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হতে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা সেভাবে ঋণ পায় না। এজন্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে। সে প্রতিযোগিতায় বিশেষ সুবিধা ভোগের সুযোগ নিয়ে বড় কারবারী বা ব্যবসায়ী আরও বড় হয়। ফুলে ফেঁপে বেড়ে ওঠে। আর ছোট কারবারী বা ব্যবসায়ী টিকতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়। বৃহদায়তন শিল্প বা কারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাই। এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধু ব্যাংকই নয়, পুঁজিপতি ও অনৈসলামী সরকারসমূহ যে বিশেষ সুবিধা ও ন্যূনতম সুদের হারে টাকা ঋণ দিয়ে থাকে, ছোট বা ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্যে আদৌ সে সুযোগ নেই। ফলে বড় শিল্পপতিরা প্রতিযোগিতাহীন বাজার একচেটিয়া কারবারের সমস্ত সুযোগ লাভ করে। পরিণামে সামাজিক বৈষম্য আরও প্রকট হয়।

পঞ্চমত : সুদের ফলেই পুঁজি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার সুযোগ পায়। তাদের হাতেই পুঁজি আবর্তিত ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা সুদের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, হাত গুটিয়ে বসে থাকা একটি শ্রেণী বিনাশ্রমে এর সাহায্যে উপার্জন করতে পারবে। উত্তরাধিকার সূত্রে, অবৈধভাবে বা অন্য কোন উপায়ে কেউ প্রচুর অর্থ উপার্জন করলে সুদের বদৌলতেই সে তা ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যেতে পারে। এজন্যে এদের মধ্যে অকর্মণ্যতা, বিলাসিতা ও দুষ্কর্মের প্রসার ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই তখন সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত হয়।

ষষ্ঠত : সুদের জন্যে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর পরিবহণ খরচ, শুল্ক (যদি থাকে) এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে দ্রব্যের বা পণ্যসামগ্রীর বিক্রি মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের উপর উপর্যুপরি সুদ যোগ করে দেয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চারবার পর্যন্ত এবং ক্ষেত্রবিশেষে তারও বেশীবার সুদ যোগ হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের বস্ত্রশিল্পের কথাই ধরা যেতে পারে। এই শিল্পের জন্যে বিদেশ হতে তুলা আমদানীর জন্যে আমদানীকারকদের কাছ হতে ব্যাংক দেয় ঋণের জন্যে যে সুদ নেয় তা যুক্ত হয় তুলার উপর। ঐ তুলা থেকে সূতা তৈরীর জন্যে কারখানা যে ঋণ নেয় ব্যাংক হতে তার সুদ যুক্ত হয় সুতার উপর। পুনরায় ঐ সুতা হতে কাপড় তৈরীর সময়ে বস্ত্রকল সংস্থা বা ব্যক্তি যে ঋণ নেয় তারও সুদ যুক্ত হয় কাপড়ের উপর। এরপর কাপড়ের পাইকারী বিক্রেতা তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে ঋণ নেয় তারও সুদ যোগ করে দেয় ঐ কাপড়ের কারখানা মূল্যের উপর। এইভাবে চারটি স্তরে বা পর্যায়ে সুদের অর্থ যুক্ত হয়ে বাজারে কাপড় যখন খুচরা দোকানে আসে বা প্রকৃত ভোক্তা ক্রয় করে তখন সে আসল মূল্যের চেয়ে বহু গুণ বেশী দাম দিয়ে থাকে।

এমনিভাবে সমাজে দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির প্রত্যেকটিতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুদ জড়িয়ে আছে। নিরূপায় ভোক্তাকে বাধ্য হয়েই সুদের জন্যে সৃষ্ট এই চড়া মূল্য দিতে হয়। কারণ,

সুদনির্ভর অর্থনীতিতে এছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অথচ সুদ না থাকলে অর্থাৎ সুদবিহীন অর্থনীতি চালু থাকলে এই যুলুম হতে জনসাধারণ রেহাই পেত। এতে শুধু তাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ই কম হতো না, জীবন যাপনের মান হতো আরো উন্নত।

সপ্তমত : সুদের কারণেই অর্থনীতিতে ব্যবসায়-চক্রের (Business Cycle) সৃষ্টি হয়। অর্থনীতিতে বার বার মন্দা ও তেজীভাবের আবর্তন হতে থাকে যার ফলে সব সময় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। যে কোন অর্থনীতির জন্যে এ অতি মারাত্মক। অর্থনীতিতে যখন তেজীভাব থাকে তখন সুদের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে সুদের হার যখন অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তখন ঋণ গ্রহীতারা যদি হিসেব করে দেখে যে অতিরিক্ত সুদের হারের কারণে লাভের সম্ভাবনা খুব কম তখন তারা ঋণ নেয়া বন্ধ করে দেয়। এর ফলে পুঁজি বিনিয়োগে ভাটা পড়ে। পরিণামে উৎপাদন কমে যায়, শ্রমিক ছাঁটাই হয়। ব্যবসায়ে সৃষ্টি হয় মন্দা। এই সময়ে ব্যাংক যখন দেখে যে, পুঁজির চাহিদা খুব কমে গেছে তখন ব্যাংক সুদের হার কমিয়ে দেয়। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি নতুন করে ঋণ নিয়ে পুনরায় উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন দেয়। ক্রমে ক্রমে মন্দা কেটে গিয়ে তেজীভাবের সৃষ্টি হয়। এভাবে বার বার মন্দা ও তেজীর সৃষ্টি অর্থনীতি ও জনকল্যাণের জন্যে যে অত্যন্ত অশুভ ও মারাত্মক পরিণতির সৃষ্টি করে সে বিষয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তরাও একমত।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ ও অর্থনীতির জন্যে সুদ কত মারাত্মক ক্ষতিকর। সুদের যেসব অপকার বা ক্ষতিকর দিক আলোচনা করা হলো সেসব ছাড়াও আরও ক্ষতিকর দিক রয়েছে। কিন্তু সেসব শুধু জটিলই নয়, তা আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্রও এটা নয়। প্রকৃতপক্ষে সুদনির্ভর অর্থনীতি কতখানি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হতে পারে এবং কি উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা সুদ হারাম করেছেন তা তুলে ধরাই ছিল এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্য।

অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে সঞ্চয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সুদ আসলেই অর্থনীতির জন্যে অপরিহার্য নয়,

সঞ্চয়ের জন্যে তো নয়ই। বরং তা অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। সুদনির্ভর পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা ও বিশ্ববিশ্রুত অর্থনীতিবিদ লর্ড জন মের্নাড কীনস তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ "The General Theory of Employment, Interest and Money"-তে সপ্রমাণ করেছেন যে, সঞ্চয়ে সুদের কোন ভূমিকা নেই। সুদ না নিলেও লোকে ব্যক্তিগত কারণেই অর্থ সঞ্চয় করবে। দুর্দিনের খরচ ও আকস্মিক বড় ধরনের ব্যয় মেটাবার প্রয়োজনেই তারা সঞ্চয় করে।

তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, সুদই হচ্ছে অর্থ বন্টনের অসমতার কারণ ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক। সুদের জন্যেই বরং মূলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে। যে কোন দেশের অর্থনীতির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সুদের উচ্চহারের সময়ে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াস সংকুচিত হয়েছে। অপরদিকে সুদের হার যখন ন্যূনতম তখনই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সঙ্গে অর্থনৈতিক কর্মপ্রয়াসও বেড়ে গেছে। এসব হতে বুঝতে কারো বাকী থাকে না যে, সুদ সত্যি সত্যি অর্থনৈতিক সাম্যেরই শুধু বিরোধী না অগ্রগতিরও বিরোধী।

অতএব, অর্থনীতি সুদবিহীন হলে বিনিয়োগের জন্যে যেমন অর্থের অব্যাহত চাহিদা থাকবে তেমনি সঞ্চয়েরও সদ্ব্যবহার হবে। এর ফলে নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সম্পদের পূর্ণ বণ্টন ঘটবে। তাছাড়া প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একচেটিয়া কারবার হ্রাস পাবে। অতি মুনাফার সুযোগ ও অস্বাভাবিক বিনিয়োগ প্রবণতা দূর হবে। এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ও সব ধরনের শোষণের পথ বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যেই ইসলাম সুদকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। আব্বাসীয় খিলাফতের পরবর্তী সময়েও মুসলিম জাহানে এ নির্দেশ মেনে চলা হয়েছে। দীর্ঘ নয় শত বছরেরও বেশী বিশ্বের এক বিশাল ভূখণ্ডে সুদবিহীন অর্থনীতি চালু ছিল। তার ফলে সে অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধিও ঘটেছিল অবিশ্বাস্য রকম।

সুদের বিপরীতে করযে হাসানা ও মুদারাবা ছাড়াও মুশারাকা, বাই-ই সালাম, বায়-ই মুয়াজ্জাল, ইজারা, কেরায়া, মুরাবাহা, মুজারাআত, শুকাক্বাত, ইসতিসনা, শিরকাতুল মিলক প্রভৃতি নানা শরীয়াহসম্মত পদ্ধতির তখন উদ্ভব হয়েছিল। আজকের ইসলামী ব্যাংক ও ইনভেস্টমেন্ট হাউস এসব পদ্ধতিই ব্যবহার করে চলেছে সাফল্যের সাথে।

আজও সেই একই নির্দেশ মান্য করে সফলতা লাভ না করার কোন কারণ নেই। বরং ঈমানের দাবীই হচ্ছে, যা হারাম তাকে হারাম জানা আর যা হালাল তাকে হালাল জানা। 'নেহী আনিল মুনকার' বা দুর্নীতির প্রতিরোধ করতে হলে অর্থাৎ সমাজ হতে সব ধরনের যুলুম ও বঞ্চনার অবসান ঘটাতে হলে তার উৎসকেই বিনাশ করতে হবে। সেটাই বৈজ্ঞানিক পন্থা। ইসলামী অর্থনীতি এক্ষেত্রে সর্বকালের সর্বযুগের জন্যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজ হতে তাকে সমূলে উৎখাত করে।

১২. অবৈধ উপায়ে আয় ও অবৈধভাবে ব্যয় রোধ

সামাজিক জীবনে অনাচারের ও অন্যায়ের সুযোগ আসে অর্থনৈতিক বিশৃংখলার মধ্যে দিয়ে। পৃথিবীর সভ্যতাসমূহের ইতিহাস তার সাক্ষী। কোন ব্যক্তির আয় বা ব্যয় অথবা উভয়ই যদি অবৈধভাবে হয় তবে তার কাজ থেকে সমাজ ও দেশ মহৎ কিছু তো দূরে থাক, ভাল কিছুও আশা করতে পারে না। উল্টো সমাজের জন্যে সে ব্যক্তি দুষ্টক্ষত। ক্রমেই যদি এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে সে দেশের বা জাতির জীবনাদর্শ যতই উত্তম হোক না কেন তার অধঃপতন অবধারিত। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈধতার প্রশ্ন রয়েছে। নিষিদ্ধ বা হারাম করে দেয়া হয়েছে সব ধরনের অবৈধ আয় ও অবৈধ ব্যয়। একজন মুসলিমের উপার্জন অবশ্যই হালাল বা বৈধ পন্থায় হতে হবে। কোনক্রমেই অবৈধ উপায়ে উপার্জন করা চলবে না।

সাধারণত যেসব অবৈধ উপায়ে আয়ের পন্থা সমাজে চালু রয়েছে সেগুলির মধ্যে উৎকোচ বা ঘুষ, সুদ, হারাম পণ্য সামগ্রীর ব্যবসা, কালোবাজারী, চোরাকারবারী, অবৈধ ব্যবসা, নাচ-গান, ফটকাবাজারী, পরদ্রব্য আত্মসাৎ,

সব ধরনের প্রতারণা, ধাপপাবাজী, নানারূপে পতিতাবৃত্তি, লটারী, সমস্ত প্রকারের জুয়া প্রভৃতিই প্রধান। এসব হারাম ও অশ্লীল পথে উপার্জন নিষিদ্ধ করে ইসলাম সমাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিকেই বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তৎকালীন সময়েই শুধু নয়, বর্তমান যুগেও আর কোনও ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এত ব্যাপকভাবে অবৈধ ও অশ্লীল উপায়ে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। সে কারণেই সেসব মতাদর্শে সামাজিক দুর্নীতি ও অনাচারের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে।

আজকের পুঁজিবাদী বিশ্বের পুরোধা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নজর দিলেও এ সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যাবে। সে দেশের নেশা ও মাদক দ্রব্যের তালিকায় আফিম, চণ্ডু, গাঁজা, চরস, হাশিস ইত্যাদি এখন প্রাচীন। এ সবের সঙ্গে বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকদের কৃপায় যুক্ত হয়েছে এল. এস.ডি, কোকেন, বারবিচুরেটস, মরফিন, কোডিন, মারিজুয়ানা, ফেনমিট্রাজিন ও হিরোইনের মত মারাত্মক সব সামগ্রী। নেশার এসব সামগ্রীর সর্বনাশা কুফলে মার্কিন জনজীবন আজ পর্যুদস্ত, যুব সম্প্রদায়ের বিরাট এক অংশ বিপথগামী। অপরাধবিজ্ঞানী ও সমাজ মনোবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে সে দেশে ক্রমবর্ধমান খুন, জখম, রাহাজানি, ছিনতাই, ধর্ষণ, ব্যাংক লুট ইত্যাদি অপরাধে অপরাধীদের বিরাট একটা অংশ নেশাগ্রস্ত যুবক-যুবতী। নেশার ও মাদক দ্রব্যের বদৌলতেই উম্মাদ ও বিকৃত মানসিকতাগ্রস্ত রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে শনৈঃ শনৈঃ।

অসৎ কাজে নিষেধের নৈতিক তাগিদ সেখানে নেই বলেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ এসব মাদক দ্রব্য ও নেশার সামগ্রীর উৎপাদন, বিক্রি ও পাচার বন্ধ করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু এই অবৈধ সামগ্রীসমূহের ব্যবসায়ে মুনাফার পরিমাণ এত অবিশ্বাস্য রকম বেশী এবং আইনের এত ছিদ্রপথ রয়েছে যে কোনক্রমেই এর প্রসার প্রতিরোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। একই কারণে বাংলাদেশের শহর-বন্দর ছাড়াও গ্রামে-গঞ্জেও ফেনসিডিলসহ নেশার দ্রব্য এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে-এর ছোবলে সমাজ জীবন আজ মারাত্মক বিপর্যস্ত।

অবৈধ উপায়ে আয় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ মুখ্যতঃ তিনটি। প্রথমতঃ অবৈধ আয়ের উদ্দেশ্যে জনগণের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুলুম করা হয়। অহেতুক হয়রানী করে বা কৌশলে প্রতারণা করে অথবা বাধ্য করে লোকদের নিকট থেকে ব্যক্তি বিশেষ বা অনেক সময় শ্রেণী বিশেষ উপার্জন করে থাকে। এতে জনগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি সমাজে সৃষ্টি হয় অসন্তোষ। দরিদ্র ও সাধারণ লোক তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হতে হয় বঞ্চিত। উপরন্তু কলহ, বিশৃঙ্খলা, বিদ্বেষ ও বিভেদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত হয়। এ সবই ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও গণস্বার্থের পরিপন্থী।

অনেক সময়ে ব্যক্তি বিশেষও নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে অবৈধ অর্থ দিয়ে থাকে। যেমন উৎকোচ বা ঘুষ। বিশ্বের সর্বত্রই এটা সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বহু দেশে সামরিক আইন পর্যন্ত চালু করা হয়েছে ঘুষ উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকেই ঘুষ নিতে দেখা গেছে। ঘুষ বা 'উপরি আয়' আজ অন্য আর দশটা উপায়ে আয়ের মতোই খুব সহজ ও স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত হচ্ছে। কিন্তু যারা ঘুষ নেয় বা দেয় তাদের উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম (সা) সতর্ক করে দিয়ে বলেন-

"ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী উভয়েরই উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।"

(বুখারী, মুসলিম)

দ্বিতীয়ত : চারিত্রিক নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী বিষয় যেমন চলচিত্র, নৃত্য, সঙ্গীত, মদ, বেশ্যাবৃত্তি, সব ধরনের অশ্লীল কাজ ইসলামী সমাজে নিষিদ্ধ। এসবের ব্যবসা করাও তাই নিষিদ্ধ। সমাজে এসব কাজের এতটুকুও প্রশ্রয় দিলে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও কলুষতা ছড়িয়ে পড়বে। এর বিষ বাষ্প প্রবেশ করবে সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ফলে চরিত্র হননের সীমা থাকবে না। গোটা সমাজ পাপ-পংকিলতায় নিমজ্জিত হবে। সেজন্যই এসব জিনিষের ভোগ শুধু নিষিদ্ধ নয়, এসব বিষয়ের শিল্প-কারখানা তৈরী করা, ব্যবসা করা অর্থাৎ এ সমস্ত উৎস হতে উপার্জন করাও ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তৃতীয়ত : অবৈধ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদ সাধারণত অবৈধ কাজেই ব্যয়

হয়। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ রয়েছে- Ill got ill spent অর্থাৎ, যেমন অবৈধভাবে আয়, তেমনি অবৈধভাবে ব্যয়। অবৈধ কাজে ব্যয়ের অর্থই হচ্ছে সামাজিক অনাচার ও পংকিলতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এমনিতেই সমাজে নানা দুষ্কর্ম ঘটছে। সেসবের প্রতিরোধ করার যত পন্থাই গৃহীত হোক না কেন, ঐ সব খাতে অর্থ ব্যয়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে না পারলে কোন উপায়ই সাফল্য লাভ করবে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অবৈধ ও অসৎ উপায়ে যারা আয় করে থাকে তারা সে আয় নানা সমাজবিরোধী তথা ইসলামী অনুশাসন বিরোধী কাজে ব্যয় করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ নাচ-গান, সিনেমা, নানা রং-তামাশা, বিলাস-ব্যসন, মদ্যাসক্তি, উচ্ছৃংখল জীবন যাপন, বেশ্যাগমন, প্রাসাদোপম বাড়ী তৈরী প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এর যে কোন একটিই সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যে যথেষ্ট। যদি এর সবগুলিই কোন সমাজে বা জাতির মধ্যে ক্রমে ক্রমে অনুপ্রবেশ করে তবে শুধু যে এসবের ভোক্তা ও উদ্যোক্তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাই না, গোটা সমাজ ও জাতির চূড়ান্ত সর্বনাশ হবে। এ জন্যেই অবৈধ খাতে ব্যয় ইসলাম কোনক্রমেই অনুমোদন করে না।

অবৈধ উপার্জন হতে অবৈধ খাতে ব্যয়ই শুধু নিষিদ্ধ নয়, হালাল উপার্জন হতে অবৈধ পথে ব্যয়ও নিষিদ্ধ। এমনকি হালালভাবেও কোন বাহুল্য খরচ করার অনুমোদন নেই। ইসলামে অপব্যয়কারীকেও পছন্দ করা হয় না। কৃপণকেও নয়। আল-কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-

إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-২৭)

অপব্যয়ের ছিদ্রপথেই সংসারে আসে অভাব-অনটন। সমাজে আসে অশান্তি। অশান্তি আর অনটন হতে রক্ষা পেতে হলে মিতব্যয়ীতাই হওয়া উচিৎ আদর্শ। কৃপণতা যেমন অপরাধ, অপব্যয়ও তেমনি অপরাধ, এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথই হচ্ছে উত্তম পথ। অর্থাৎ মিতব্যয়ীতাই উত্তম পথ। এ ব্যাপারে আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ـ

অর্থ : তারাই আল্লাহর নেক বান্দা যারা অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে না অপচয় ও বেহুদা খরচ করে, না কোনরূপ কৃপণতা করে। বরং তারা এ উভয় দিকের মাঝখানে মজবুত হয়ে চলে। (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত-৬৭)

বাস্তবিকই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তথা সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনে আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সততা ও মধ্যম পন্থা অনুসরণ করে চললে সুষ্ঠু ও সাবলীল উন্নতি হতে পারে। বস্তুতঃ পুঁজিবাদী সমাজের অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও বর্ধিষ্ণু সামাজিক অনাচার ও পাপাচারের মূখ্য কারণ অপব্যয় ও অবৈধ পন্থায় ব্যয়। এ জন্যেই ইসলাম এর মূলোচ্ছেদ করেছে।

প্রসঙ্গত ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্বের কথাও উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তি মানুষের অপরাধ প্রবণতা যদি আল্লাহর ভয়ে ও রাসূলের (সা) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সংশোধিত না হয় তাহলে সরকার অবশ্যই ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে ন্যূনতম ব্যবস্থা হচ্ছে, যাদের হাতে সীমাতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ রয়েছে তাদের সেসব সম্পত্তি বৈধ বা জায়েয পথে অর্জিত হয়েছে কি না তা নির্ণয় করা। এ উদ্দেশ্যেই মহান খুলাফায়ে রাশিদীনের (রা) যুগে "হিস্বাহ" নামে একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দপ্তরটির কাজ ছিল অবৈধ উপায়ে আয় রোধ করা এবং এই জাতীয় আয় কারো হক বা অধিকার হরণ করার ফলে হয়ে থাকলে তা মূল মালিকের কাছে প্রত্যার্পণ করা। যদি তা সম্ভব না হয় বা সেভাবে আয় না হয়ে থাকে তবে তা বায়তুলমালেই জমা দেয়া হতো।

১৩. ব্যবসায়ে সর্বপ্রকার অসাধুতা দূরীকরণ

সর্বপ্রকার ব্যবসায়িক অসাধুতা ইসলামী অর্থনীতিতে শুধু নিন্দনীয়ই নয়, বরং কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বর্তমান বিশ্বে, বিশেষত পুঁজিবাদী ও আধা পুঁজিবাদী দেশসমূহে ব্যবসায়িক অসাধুতার জন্যে প্রকৃতপক্ষে কোন শাস্তি নেই। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে স্ব স্ব দেশের সরকার হয় খুবই উদার

মনোভাব গ্রহণ করে থাকে, নয় তো তাদের দমন করা বা শাস্তি দেয়ার সত্যিকার ক্ষমতা সরকারের নেই। শুধু কালোবাজারী বা চোরাকারবারীই ব্যবসায়িক অসাধুতা নয়, মজুতদারী, ওজনে কারচুপি, ভেজাল দেয়া, নকল করা প্রভৃতিও জঘন্য ধরনের অপরাধ। প্রচলিত আইনের ফাঁক দিয়েই নকল জিনিস বাজারে বিক্রি হয় অবাধে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ও বিভিন্ন দেশের সরকার ভেজাল নিরোধক আইন প্রয়োগের চেষ্টা করছে। কিন্তু রুই, কাতলারা সে আইনের জালে ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে চুনো পুঁটিরাই। আইনের এই বজ্র আঁটুনি, ফস্‌কা গেরো ইসলামে সর্ব অবস্থাতেই পরিত্যাজ্য।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসায়িক অসাধুতার আশ্রয় নিতে পিছপা হয়নি। সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে বিক্রির জন্য প্রদর্শিত নমুনা অনুযায়ী গম না পাঠিয়ে পাঠিয়েছে নিম্নমানের গম। তাই নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে তুমুল হৈ চৈ। শেষ অবধি মার্কিন সরকারকে ঐ গম ফেরত নিতে হয়েছে। চাকুরীচ্যুত হয়েছে বেশ কিছু কর্মকর্তা। ইসলাম এই ধরনের অসাধুতা ও প্রতারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। ব্যবসায়িক সততা ও নিষ্ঠার প্রবর্তন অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের এক বলিষ্ঠ বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

অধিক লাভের আশায় পণ্য মজুত রাখা বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে কোন অপরাধ নয়। বরং একে উৎসাহিতই করা হয়। এর ফলে পণ্য মূল্য বেড়ে যায় হু হু করে। জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকে না। অনেক সময় সমগ্র জাতি নিপতিত হয় অশেষ দুর্ভোগের মধ্যে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। সে যে প্রকারেই হোক না কেন। আমাদের দেশেও দেখা যাবে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী মৌসুমের শুরু হতেই ধান-চাল, পিয়াঁজ, রসুন, সবরকমের ডালসহ নানারকম শস্য বিপুল পরিমাণ গুদামজাত করে রাখে। ফলে বাজারে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম সংকট। দাম বেড়ে যায় দ্রুত। এই সুযোগেই বিপুল অর্থ উপার্জন করে মজুতদার। একইভাবে শিল্পজাত পণ্যেরও মজুতদারী চলে। কাগজ, সাবান, টুথপেষ্ট, শিশুখাদ্য, সিমেন্ট, সার, সুতা, চিনি, ভোজ্য তেল, টিন– হেন বস্তু নেই যা ব্যবসায়ীরা মজুত করে না। সে মজুতের পরিমাণ এত বেশী যে

বাজারে কৃত্রিম সংকট দেখা দেবেই। সৃষ্টি হবে এক দুঃসহ অস্বাভাবিক অবস্থা। সাধারণ মানুষ তখন এদের কাছে কৃপার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে এই ধরনের অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে বারবার। এই সংকট কাটিয়ে উঠবার জন্যে যে ধরনের ব্যবস্থা নেয়া দরকার সরকার সে ধরনের ব্যবস্থা নিতেও ব্যর্থ হয়েছেন।

মজুতদারী বা ইহতিকার সম্পর্কে রাসূলে কারীম (সা) বলেন– "খাদ্যশস্য মজুতকারী ব্যক্তির মনোভাব অত্যন্ত বীভৎস ও কুটিল। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হলে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে, আর মূল্য বৃদ্ধি পেলে তারা আনন্দিত হয়।" (মুসলিম)

এর প্রতিবিধানের জন্যে ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য মজুত কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত ইবনে উমর (রা) রাসূলে কারীম (সা) হতে বর্ণনা করেছেন-

"যে ব্যক্তি ইহতিকার করবে অর্থাৎ, অতিরিক্ত দামের আশায় চল্লিশ দিন যাবৎ খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় না করে আটক রাখবে আল্লাহর সঙ্গে তাঁর ও তাঁর সঙ্গে আল্লাহর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।" (মুসনাদে আহমদ)

পণ্যদ্রব্য পরিমাপে কারচুপিও ইসলামে নিষেধ। ওজনে বা মাপে কম দেয়ার প্রবণতা ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মতো প্রসার লাভ করেছে। পরিমাপে প্রতারণার জন্যে জনসাধারণ উচিৎ মূল্য দিয়েও যথোচিত পরিমাণ সামগ্রী হতে বঞ্চিত হয়। ব্যক্তি ও জনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ ব্যবসায়ী শ্রেণী অবৈধ উপায়ে আয়ের মাধ্যমে ক্রমে আরও সম্পত্তি অর্জন করে। আমাদের দেশের যে কোন সরকারী ক্রয়কেন্দ্রে আখ, পাট বা ধানের ওজন এবং সাধারণ আড়তদারের কলাই, মসুর, হলুদ, সরিষা, চাল, আলু, শাক-সবজী প্রভৃতির ওজন লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কিভাবে কৃষকদের প্রতারণা করা হয়। ওজনে ফাঁকি দেয়া বা ইচ্ছাকৃতভাবে ওজনে কম দেয়া এসব জায়গায় স্বীকৃত স্বাভাবিক ব্যাপার বলে গণ্য। প্রতিবাদ করেও কৃষকরা প্রতিবিধান পায় না। বরং পণ্য সামগ্রী নিম্নমানের, ভিজা, সময় পার হয়ে গেছে ইত্যাদি নানা মিথ্যা ও বানোয়াট অজুহাতে তাদের হয়রানীর একশেষ করা হয়।

এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন-

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ- الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ- وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ-

অর্থ : যারা ওজনে কম দেয়-পরের জিনিস ওজন করে নিলে তখন পুরোপুরি গ্রহণ করে। কিন্তু অপরকে যখন ওজন করে দেয় তখন তার পরিমাণ কম দেয়– এরা নিশ্চিতরূপে ধ্বংস হবে।

(সূরা আল-মুতাফফিফীন, আয়াত-১-৩)

আল-কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে-

وَأَوْفُوْا الكَيْلَ وَلاَتَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ- وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ- وَلاَتَبْخَسُوْا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِيْ الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ-

অর্থ : অতএব, তোমরা মাপে ঠিক দাও এবং কারো ক্ষতি করো না। সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ঠিকমত ওজন কর। লোকদের পরিমাপে কম বা নিকৃষ্ট কিংবা দোষযুক্ত জিনিস দিওনা ও দুনিয়াতে অশান্তির সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না। (সূরা আশ্‌শূয়ারা, আয়াত ১৮১-১৮৩)

এই একই বিষয়ে সূরা আল-আনআম (১৩৫ আয়াত), সূরা আল-আরাফ (৮৫ আয়াত) ও সূরা বনি ইসরাইলেও (৩৫ আয়াতে) উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়, ব্যাপারটিকে আল্লাহ সুবহানা তায়ালা কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন।

মজুতদারী থেকে যেমন মুনাফাখোরীর মানসিকতার সৃষ্টি হয়, তেমনি ব্যবসায়িক অসাধুতা হতেই নৈতিকতাবিরোধী ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে। এ জন্যেই দেশে দেশে কালোবাজারী ও চোরাকারবারী সংঘটিত হচ্ছে। দেশপ্রেম বা জনগণের স্বার্থ এদের কাছে কোন বিবেচ্য বিষয় নয়। যেভাবেই হোক না কেন, অধিক হতে অধিকতর মুনাফা অর্জনই এদের

একমাত্র লক্ষ্য। বৈষয়িক উন্নতির খাতিরে এরা নৈতিকতাকে কুরবানী করেছে। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, চোরাকারবার যেমন দেশের অর্থনৈতিক ধ্বংস ডেকে আনে, কালোবাজারীও তেমনই সামাজিক অবক্ষয়ের গতি ত্বরান্বিত করে। এই দুয়ের যোগফলে যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তলাহীন পাত্রের মতো হতে বাধ্য। ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে এই উভয়ই শুধু নিষিদ্ধই নয় বরং যারা এসব গণস্বার্থ বিরোধী ও সামাজিক বিশৃখংলা সৃষ্টিকারী কাজে লিপ্ত তাদের সমুচিত শাস্তিরও বিধান রয়েছে।

১৪. ফটকাবাজারী ও সর্ববিধ জুয়া উচ্ছেদ

আজ যেমন সর্বত্র নানা ধরনের জুয়া চলছে, তেমনি অতীতেও এর প্রচলন ছিল। সত্যি কথা বলতে কি জুয়ার ইতিহাস বহু প্রাচীন। জুয়ার কবলে পড়ে অসংখ্য পরিবার যে সর্বস্বান্ত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সুসংহতরূপ নেবার পরে জুয়ার আরও চমকপ্রদ ও নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্বে জুয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তীর ও পাশার খেলা। পরবর্তীতে তার সঙ্গে একে একে যুক্ত হয়েছে ঘোড়দৌড়, তাসের বিভিন্ন খেলা, হাউজী, রুলেতে, শব্দচয়ন, লটারী, প্রাইজবণ্ড ইত্যাদি নানা ধরনের ও কৌশলের জুয়া। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফটকাবাজারী বা Speculation। ফটকাবাজারী সম্পূর্ণতঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবদান। শেয়ার মার্কেটে সম্ভাব্য মুনাফার রং ফলানো হিসেবের অনুশীলনী দেখিয়ে জিনিসপত্র বা শেয়ারের আগাম বিক্রি ও অন্যান্য অপকৌশলের ফলে কত পরিবার যে নিঃস্ব হয়েছে তার হিসেব নেই।

জুয়াকে তাই ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ধোঁকাবাজী বা প্রতারণার ঘোর শত্রু ইসলাম। প্রচলিত সমাজ জীবনে আজ যেমন জুয়া মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইসলামের আবির্ভাবের যুগেও তেমিন ছিল। জুয়ার খপ্পরে পড়লে নিরীহ মানুষের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা থাকে না। কিন্তু একদল লোক এরই মাধ্যমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে থাকে। ইসলামী অর্থনীতিতে এজন্যে সব ধরনের জুয়াকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ (المائدة : ٩٠)

অর্থ : হে মুমিনগণ! জানিয়ে রাখ, মদ জুয়া মূর্তি এবং (গায়েব জানার জন্যে) পাশা খেলা, ফাল গ্রহণ ইত্যাদি অতি অপবিত্র জিনিস ও শয়তানের কাজ। অতএব, তোমরা তা পরিত্যাগ কর। তবেই তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (সূরা আল মায়েদা : আয়াত-৯০)

রাসূলে কারীম (সা) বলেছেন-

"যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজী করে সে আমার তরীকার লোক নয়। (সিহাহ সিত্তাহ)

মূখ্যত তিনটি মৌলিক কারণে ইসলামী অর্থনীতিতে সর্ববিধ জুয়া ও ফট্কাবাজী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলি হচ্ছে-

প্রথমত : জুয়ার কারণে প্রভূত অর্থের অপব্যয় ও মূল্যবান সময়ের অপচয় হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই। সুতরাং, জুয়ার মাধ্যমে অর্থের অপব্যয় করে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তাঁর অভিশপ্ত শয়তানের ভাই হোক কোনক্রমেই তা কাম্য হতে পারে না। ঘোড়দৌড়, শব্দচয়ন, তাসের খেলা, ভাগ্য পরীক্ষা, লটারী ইত্যাদির দ্বারা কত যে অর্থের ও সময়ের অপচয় হয় তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় দুঃসাধ্য। অধিকন্তু সাধারণ মানুষ যে ধোঁকায় নিপতিত হয় তাও ক্ষতিকর। তাছাড়া জুয়া নেশার মতো। একবার এর খপ্পরে পড়লে এ থেকে অব্যাহতি পাওয়া খুবই দুরূহ। একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে না দাঁড়ানো পর্যন্ত অনেক লোকই এর হাত হতে নিষ্কৃতি পায়নি। শুধুমাত্র ঘোড়ার রেসেই কত লোক সর্বস্ব খুইয়েছে তার হিসেব করা শক্ত। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বহু দেশেই আজ ঘোড়ার রেস তাই শুধু নিষিদ্ধই নয়, সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : জুয়া সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক অপরাধ সৃষ্টিকারী। শুধুমাত্র জুয়ায় হার-জিতের কারণেই মানুষের মধ্যে কলহ ফাসাদ, মারামারি এবং শেষ পর্যন্ত খুন-জখম সংঘঠিত হচ্ছে এরকম ভুরি ভুরি নজীর রয়েছে। আমাদের দেশেও বড় বড় শহরের লঞ্চ বা রেলস্টেশনের ধারেই দেখা যাবে নানান ধরনের জুয়ার ফাঁদ পেতে বসে আছে এক শ্রেণীর লোক। শহরগামী গ্রামের নিরীহ মানুষ এদের ফাঁদে পা দিয়ে সমস্ত টাকাকড়ি খুইয়ে তারপর সম্বিত ফিরে পায়। জুয়ার আড্ডা হতে সরাসরি জেলখানায় বা ফাঁসির মঞ্চে পৌঁছে গেছে এমন দৃষ্টান্ত শুধু বিদেশে নয়, আমাদের দেশেও কম নেই। বিশৃংখলা, বিদ্বেষ, মারামারি, নৈরাজ্য ইত্যাদি সব ধরনের সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করার বা উস্কে দেবার বিশেষ গুণ রয়েছে জুয়ার। সুতরাং, সামাজিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্যেও জুয়া সম্পূর্ণতঃ রহিত হওয়া একান্তই জরুরী।

তৃতীয়ত : জুয়ার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক লোককে প্রতারণা করে মুষ্টিমেয় কিছু লোক বিনাশ্রমে বিপুল অর্থ উপার্জন করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে কোন অবৈধ উপায়ে আয় ইসলামে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ বা হারাম। জুয়ার মাধ্যমে উপার্জনও তাই হারাম। জুয়ার দ্বারা কৌশলে অল্প সময়ে বিনা আয়াসে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব বলে একদল লোক যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও হালালভাবে আয়ের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকে। উপরন্তু জুয়ার ব্যবসা চালু রেখে তারা সামাজিক দুর্নীতি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। এসব কারণেও জুয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।

সুতরাং, সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, ইসলামে বৃহত্তম সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ও নৈতিকতা বিবর্জিত কাজের পথ সম্পূর্ণতঃ রুদ্ধ করার জন্যে সকল দুর্নীতির প্রতিরোধ বা 'নেহী আনিল মুনকারের' আদেশ দিয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে এই কারণেই সুদ ও সুদনির্ভর সব ধরনের কারবার, হারাম জিনিসের শিল্প ও ব্যবসা, অবৈধ উপায়ে আয় ও অবৈধভাবে ব্যয়, প্রতারণা ও জুয়া সব কিছুই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এতেই যে সকল মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন। রাসূলে কারীম (সা) ও

মহান খুলাফায়ে রাশেদীনের (রা) আমলে ইসলামী অর্থনীতির এই দিকগুলির পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়েছিল বলেই ইসলামী অর্থনীতি শুধু যে সাফল্যই অর্জন করেছিল তাই নয়, যুগপৎ ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা মানুষের জন্যে শ্রেষ্ঠ ও কল্যাণকর জীবনাদর্শরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

উপসংহার

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে অর্থনীতি সংক্রান্ত যেসব বৈপ্লবিক নির্দেশ দিয়েছেন– যার মধ্যে আদেশ ও নিষেধ দুই-ই রয়েছে– সেসবই ইসলামী অর্থনীতির মূলভিত্তি। নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর সমগ্র বিপ্লবী জীবনে সেসব শুধু বাস্তবায়িতই করেননি সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনে তিনি প্রচলিত অর্থনৈতিক বিধান ও কার্যক্রমসমূহের পুনর্বিন্যাস করেন। অধিকন্তু মহান খুলাফায়ে রাশেদীন (রা) তাদের গৌরবময় খিলাফতকালে মুসলিম প্রশাসক ও সেনাপতিদের যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং মক্কা মুয়ায্যামা ও মদীনা মুনাওয়ারাতে যে কর্মপদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন তার ফলশ্রুতিতেই ইসলামী অর্থনীতির বুনিয়াদ সুদৃঢ় ও মজবুত হয়ে গড়ে উঠেছিল। প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সৎ ও মানবিক নীতির প্রবর্তন করে এবং যাবতীয় অসামাজিক ও অমানবিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে, সমাজ বিধ্বংসী দুর্নীতির কবর রচনা করে ইসলাম যে বিপ্লব সংঘটিত করেছিল সমকালীন ইতিহাসে তার সমতুল্য কোন নজীর নেই।

রাসূলে করীম (সা) খুলাফায়ে রাশেদার (রা) আমলে নির্যাতিত ও সাধারণ দরিদ্র মুসলিমদের অর্থনৈতিক অবস্থার এতদূর উন্নতি হয়েছিল যে যাকাতের অর্থ নেবার লোক খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর। ব্যবসায়ীরা এত নিরাপত্তা ও শান্তির সঙ্গে ব্যবসা করেছে যে সুদূর চীন পর্যন্তও তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছে। কাফেলার একটি উটের কোন সামগ্রীর কিছুমাত্র খেয়ানত হয়নি। যাকাতের অর্থে বায়তুল মালে এত সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে যে সাধারণ মঙ্গলজনক কাজ করার পরেও সার্বিক উন্নয়নের কাজে তা ব্যয় হয়েছে। ভূমির উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার, ভূমিস্বত্ব আইনের পুনর্বিন্যাস

এবং উশর ও খারাজ নীতির ফলে অনাবাদী জমি যেমন ব্যাপক চাষ হয়েছে, তেমনি নারীরাও বিজিত দেশের অমুসলিম কৃষকরা সম্পত্তিতে তাদের অধিকার পাওয়ায় মালিকানার ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। সুদ, জুয়া ও অন্যান্য অর্থনৈতিক যুলুমের উচ্ছেদের ফলে বিত্তশালীদের যেমন বিনাশ্রমে আরও অর্থশালী হওয়ার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়েছে তেমনি করযে-হাসানার দ্বারা জনসাধারণের দুর্ভোগের ভার লাঘব হয়েছে। সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার এমন মহান দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোনও মতাদর্শ বা জীবন ব্যবস্থায় নেই।

যে বিপ্লবী কর্মপন্থা ও নীতিমালা অনুসৃত হওয়ার ফলে ইসলাম একদিন গৌরব ও সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌছেছিল সেসব কর্মপন্থা ও নীতিমালা আজও বিদ্যমান এবং তেমনি সাফল্য অর্জন আজও সম্ভব। প্রয়োজন শুধু দুটি জিনিসের। প্রথম, বিচ্ছিন্নভাবে শুধু ইসলামী অর্থনীতি নয়, সামগ্রিক ভাবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে অর্থাৎ, ইসলামের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, আইন-বিচার-প্রশাসন ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সব কিছুকেই একটি পূর্ণ সামগ্রিকতায় গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। তার জন্যে দরকার কায়মনোবাক্যে সুদৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়া। দ্বিতীয়, সেই মুসলমান তৈরী করা ঈমান ও আকীদার দিক দিয়ে, তাকওয়া ও পরহেজগারির দৃষ্টিকোণ হতে যার তুলনা হতে পারে একমাত্র সে নিজেই। মুসলমানের পরিচয় তো তারই মধ্যে প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠে যে ঘোষণা করবে-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ-

অর্থ : নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার রোজা আমার জীবন এবং আমার মরণ সব কিছুই বিশ্বপালক মহান রাব্বুল আলামীনের জন্যে।

(সূরা আল আনআম : আয়াত-১৬২)

মুসলমানের সমগ্র জীবনই এই সাধনায়, এই ঘোষণার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্যে উৎসর্গীকৃত হবে। পৃথিবীর বুকে একমাত্র আল্লাহরই রবুবিয়াত বা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই কুরবানী হবে তার জীবন, ধনসম্পদ ও সমস্ত

প্রয়াস। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তার একমাত্র লক্ষ্য। এ জন্যেই তাকে ব্যক্তিগত পর্যায় ও সংঘবদ্ধভাবে 'আমর বিল মারূফ' ও 'নেহী আনিল মুনকারের' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইনসাফ কায়েম করতে হবে।

একজন মুসলমানকে প্রকৃত মুসলমান হতে হলে সর্ব অবস্থায় হালালকে হালালই জানতে হবে এবং হারামকে জানতে হবে সম্পূর্ণতঃ হারাম। যেমন জানতেন রাসূলে কারীমের (সা) সাহাবায়ে কেরামগণ। রাসূলুল্লাহর (সা) এই মহান সঙ্গীরা কোন কিছুরই বিনিময়ে হালালকে বর্জন বা হারামকে গ্রহণ করেননি। একবার যাকে হালাল বলে জেনেছেন তা অর্জনের জন্যে, প্রতিষ্ঠার জন্যে জান-মাল কুরবান করেছেন। একইভাবে যাকে হারাম বলে জেনেছেন তা বর্জনের জন্যে, উৎখাতের জন্যে কোন ত্যাগ স্বীকারকেই বড় বলে মনে করেননি।

আজ এমনি মুসলমানের প্রয়োজন যারা শত অসুবিধা ও বিপদের মুকাবিলাতেও হালালকে অর্জন ও ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠা এবং হারামকে বর্জন ও দুর্নীতির উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর। এ দায়িত্ব দেশের তথা বিশ্বের সচেতন মুসলিম তরুণ-তরুণীদের। তারা যদি একবার জেগে ওঠে, তৌহিদী বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সত্যিকার সদিচ্ছা ও দুর্জয় মনোবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তা হলে ইসলামী অর্থনীতির বৈপ্লবিক কার্যক্রমের প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা আজও মোটেই দুরূহ নয়।

আজ হোক কাল হোক, এ দায়িত্ব তাদের নিতে হবে। বিশ্ব যুব মুসলিমের হাতেই ইসলামের সবুজ ঝান্ডা উড়বে পৃথিবীর দিকে দিকে। সে দিন দূরে নয়।

আল-কুরআনের ভাষায়-

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ - إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا -

অর্থ : সত্য সমাগত, মিথ্যা বিদূরিত। নিশ্চয়, মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। (সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত-৮১)

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

আমীন মুহাম্মদ রুহুল, *ইসলামের দৃষ্টিতে উশর : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (ঢাকা : ইসলামিক ইকনমিকস রিসার্চ ব্যুরো-১৯৯৯)

আল-কারযাভী, ইউসুফ, *ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা* : অনুঃ আব্দুল কাদের (ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী ১৯৯১)

চাপরা, এম. উমার, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, অনুঃ মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও অন্যান্য (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০০)

মওদূদী, সাইয়েদ আবুল আলা, *ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি*, অনুঃ আবদুল মান্নান তালিব (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৬)

– *আল-কোরআনের অর্থনৈতিক শিক্ষা*, অনুঃ কারামত আলী নিযামী (ঢাকা : শহীদ স্মৃতি প্রকাশনী, ১৯৭৬)

– *অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান*, অনুঃ মুহম্মদ আবদুর রহীম (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৪)

– *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*, অনুঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ, ১৯৯৭)

রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর, *ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহী : স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ২০০১)

রহীম, মুহাম্মদ আবদুর, *ইসলামের অর্থনীতি*, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ ১৯৯৮)

শফী, মুফতী মুহম্মদ, *ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা*, অনুঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫)

সিদ্দিকী, এম, নেজাতুল্লাহ, *শরীয়তের দৃষ্টিতে অংশীদারী কারবার*, অনুঃ কারামত আলী নিযামী (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩)

হান্নান, শাহ আব্দুল, *ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা*, (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৭)

হামিদ, মুহম্মদ আবদুল, *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, অনুঃ সম্পাদনা : শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, (ঢাকা : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংস্করণ, ২০০২)

মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, (ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, ১৯৯৬)

শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ সালে খুলনা জেলার জায়গীরমহলে জন্ম। বাগেরহাট টাউন হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও পিসি কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ (১৯৬৩)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি.এ (অনার্স) (১৯৬৬) ও এম.এ (১৯৬৭) ডিগ্রী অর্জনের পর বাগেরহাট পিসি কলেজে অধ্যাপনা শুরু। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন ১৯৭০ সালে, ১৯৯৬-এ প্রফেসর পদে উন্নীত হন।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট, অর্থ কমিটি, প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য ছাড়াও অর্থনীতি বিভাগের সভাপতি ও জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করছেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার একাডেমিক কাউন্সিল সদস্য ছিলেন। ছাত্রজীবনেই বক্তৃতা ও বিতর্কের পাশাপাশি জাতীয় ইংরেজী ও বাংলা দৈনিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির শুরু। ইসলামী জীবনাদর্শ বাস্তবায়নে তাঁর লেখনী নিবেদিত। এ যাবত প্রকাশিত মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা এক ডজন। তাঁর লেখা ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ (৩য় সংস্করণ ২০০১), ছোটদের ইসলামী অর্থনীতি (১৯৮০), ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব (২য় সংস্করণ, ২০০১, ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন? (২য় সংস্করণ ১৯৮৪), ইসলামী ব্যাংক কতিপয় ভ্রান্তি মোচন (১৯৮৬), ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ (২য় সংস্করণ), বিবর্তন তত্ত্ব: ইসলামী দৃষ্টিকোণ হতে মূল্যায়ন (২০০০) শীর্ষক গ্রন্থগুলি ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্ণালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ৪০-এর অধিক। বাংলা একাডেমী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ইসলামিক ইকনমিকস্ রিসার্চ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থটসহ বেশ কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাজীবী সংগঠনের আজীবন সদস্য। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর হতেই এর শরীয়াহ কাউন্সিলের সদস্য। সেমিনার ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান, সৌদী আরব, মালয়েশিয়া সফর করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক।

ISBN 984-32-171-6